# রহস্যের চাদর

মোশাররফ হোসেন খান

# রহস্যের চাদর

## মোশাররফ হোসেন খান

এ গ্রন্থে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে চমৎকারভাবে সাজিয়ে গল্পাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যোগাযোগ পাবলিশার্স

রহস্যের চাদর : মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশক : পরিচালক, যোগাযোগ পাবলিশার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ : ১৫ই নভেম্বর ১৯৯৯
© : লেখক
প্রচ্ছদ : সুখেন দাস
কম্পিউটার কম্পোজ : রহমত কম্পিউটার্স
মুদ্রণে : আল মানার প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

**মূল্য : পঞ্চাশ টাকা**

Rahasser Chadar : Mosharrof Hossain Khan
Published By Jugajog Publishers
34, North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100
First Edition : 15 November 1999
**Taka Fifty**

উৎসর্গ

**কামরুল ইসলাম হুমায়ুন**

**নিজাম সিদ্দিকী**

প্রিয়বরেষু

## আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

**প্রবন্ধ**

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবন বীমা/সৈয়দ সরওয়ার সিদ্দিকী/১০.০০

**উপন্যাস**

দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০
মনের মানুষ/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০
প্রথম প্রেম/নিজাম সিদ্দিকী/১০০.০০

**কিশোর উপন্যাস**

মায়ের আদর/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০

**কিশোর গল্প**

অবাক সেনাপতি/মোশাররফ হোসেন খান/৫০.০০

## লেখকের অন্যান্য বই

**কবিতা**

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ

**গল্প**

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান

**সম্পাদনা**

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

**কিশোর উপন্যাস**

বিপ্লবের ঘোড়া

**কিশোর গল্প**

সাহসী মানুষের গল্প
বিস্ময়কর বিজয়
অবাক সেনাপতি

**জীবনী**

হাজী শরীয়তুল্লাহ

## গল্পসূচি


| | |
|---|---|
| আগুনের ঢাল | ৭ |
| হীরার মুকুট জ্বলে | ১৩ |
| মৌমাছির প্রহরায় শহীদের খুলি | ১৭ |
| সেই যে মানুষ সোনার মানুষ | ২২ |
| রহস্যের চাদর | ৩০ |
| পড়শির চোখে ক্রোধের আগুন | ৪১ |
| বিস্ময়কর বিজয় | ৪৫ |
| সৌভাগ্যের চাবি | ৫৮ |
| জীবন জাগার মহান সোপান | ৬৩ |
| সাহসের দরিয়া | ৬৯ |
| মাটির পাঁজরে মোহন পুরুষ | ৭৪ |

চরম বিপদে সত্য খুলেছে দুয়ার
পশ্চাতে একাকী আমি কেউ নেই আর।
—নিজাম সিদ্দিকী

পথের সীমানা। চেয়ে দেখ এই হৃদয় খামার
বিবর্ণ হয়েছে কত! বেদনায় বাজে ছলো ছলো
সোমত্ত ভরাট নদী। ডুবে যায় দেহের আমূল!
—মোশাররফ হোসেন খান

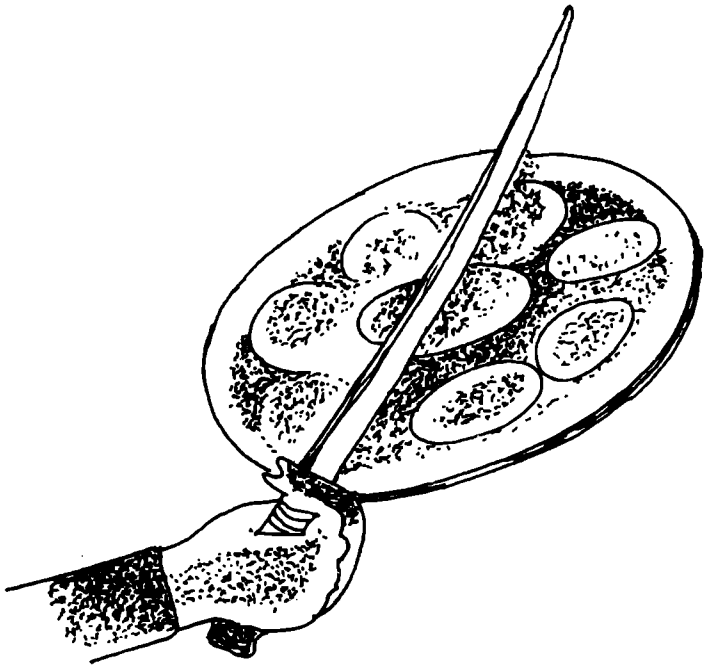

# আগুনের ঢাল

আবু তালিব।

মক্কার এক দরিদ্র ব্যক্তি।

অনেক দুঃখ কষ্টে তার সংসার চলে। সংসারে ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও অনেক বেশি। খরচের তুলনায় আয় রোজগার কম।

গরীব হলেও আবু তালিব ছিলেন অত্যন্ত সৎ। অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

ঘৃণা করতেন পাপকে।

সন্তানেরা না খেয়ে কষ্ট পেতো। তবু তিনি অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করতেন না।

আবু তালিবের বুকে ছিলো সাহসের সমুদ্র। তিনি হাসিমুখে স্বীকার করে নিতেন সকল দুঃখ কষ্ট।

এই অভাবী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেন হযরত আলী (রা)।

হযরত আলী (রা)!

যিনি শেরে খোদা নামে আমাদের কাছে পরিচিত। শের অর্থ 'বাঘ'। শেরে খোদা অর্থ 'আল্লাহর বাঘ'।

হ্যাঁ! বাঘই বটে।

ইসলামের পক্ষে হযরত আলী সকল সময় ছিলেন নিবেদিত। দুঃসাহসী। শত্রুদের জন্যে তিনি ছিলেন বাঘের মতোই ভয়ংকর। আর ইসলামের জন্যে ছিলেন ঢালস্বরূপ। যে ঢাল ছিলো আগুনের মতোই প্রজ্জ্বল, তেজদীপ্ত।

আবু তালিব ছিলেন রাসূল (সা)-এর চাচা।

চাচার সংসারে অভাব দারিদ্র্য থাকার কারণে রাসূল (সা)-এর মনে স্বস্তি ছিলো না। তিনি খুব ব্যথিত হলেন। ভাবলেন, কিভাবে চাচাকে সহযোগিতা করা যায়।

অনেক ভেবে রাসূল (সা) কিশোর আলীকে আপন সংসারে টেনে নিলেন।

রাসূল (সা)-এর নিজের কোনো ভাই ছিলো না।

আপন চাচাতো ভাই আলীকে তিনি নিজের ভাই-এর মতোই আদর যত্নে রাখতেন।

হযরত আলীর বয়স তখন দশ।

একেবারেই কিশোর বয়স।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ একদিন।

একদিন আলী (রা) দেখলেন রাসূল (সা) এবং হযরত খাদিজা (রা)-কে। তাঁরা উভয়ে সিজদায় রত।

রাসূল (সা) এবং খাদিজা (রা)-কে এভাবে সিজদারত অবস্থায় দেখে হযরত আলী অবাক হলেন। কেননা এর আগে আর কোনোদিন তিনি তাঁদেরকে এমন অবস্থায় দেখেননি।

আলী এগিয়ে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে। সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি করছেন?'

রাসূল (সা) আলীর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে খুশির দ্যুতি। বললেন, 'আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। সেই আল্লাহ। যিনি ছাড়া আমাদের আর কোনা প্রভু নেই। আর কোনো সাহায্যকারী নেই। যিনি সকল কিছুর অধিপতি, যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আমরা সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত করছি। তোমাকেও দাওয়াত দিচ্ছি। এ দাওয়াত কবুল করে তুমিও আল্লাহর ইবাদাত করতে পারো।'

আলী শুনলেন রাসূল (সা)-এর কথা।

শোনার পরপরই তিনি রাসূল (সা)-এর দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করলেন।

কিন্তু ব্যাপারটি আর কেউ জানেনি। রাসূল (সা) ও খাদিজা (রা) ছাড়া।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছর।

রাসূল (সা)-এর আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছে আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের সকল মানুষ। রাসূল (সা)-এর বাড়িতে।

খাওয়া দাওয়ার আয়োজন শেষ।

উপস্থিত সকলের দিকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা) বললেন, 'আমি আপনাদের জন্যে এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দীন ও দুনিয়ার জন্যে কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গী হবেন?'

সকলেই একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কি এনেছেন আমাদের জন্যে?'

রাসূল (সা) বললেন, 'দীন ইসলাম আর নবুওয়াত। আমি আল্লাহর শেষ নবী। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে প্রেরণ করেছেন। আপনারা কি আমার সঙ্গী হবেন?'

রাসূল (সা)-এর এ কথা শুনার সাথে সাথেই সকলের আগে, তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন হযরত আলী (রা)। বললেন, 'আমার বয়স একেবারেই কম। তার ওপর আমি অসুস্থ, দুর্বল। তবুও কথা দিচ্ছি, আমি আপনাকে সাহায্য করবো। আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম।'

কিশোর আলীই প্রথম ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন।

ইসলাম কবুলের পর থেকে হযরত আলী (রা) সর্বদা রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন।

হিজরতের সময় উপস্থিত।

একে একে অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন মদীনায়।

রাসূল (সা) অপেক্ষা করছেন আল্লাহর নির্দেশের। নির্দেশ পেলেই তিনি রওয়ানা দেবেন মদীনার পথে।

কাফেররা আরো বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাসূল (সা)-কে মারার।

বান্দাহর কোনো কিছুই অজানা থাকে না আল্লাহর কাছে। আল্লাহ পাক জানেন বান্দাহর সকল প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য, গোপন খবর।

কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ পাক রাসূল (সা)-কে জানিয়ে দিলেন মুহূর্তেই। সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন হিজরতের।

হিজরতের নির্দেশ পেয়ে রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত নিলেন মদীনায় যাবার। মক্কার চারপাশে কাফেররা ওঁৎ পেতে বসে আছে।

তারা কেবলই সুযোগ খুঁজছে। কিভাবে মারা যায় মুহাম্মাদ (সা)-কে।

কাফেরদের চোখ এড়িয়ে মদীনায় যেতে হবে রাসূল (সা)-কে। তারা যেন সামান্য সন্দেহ করার ও সুযোগ না পায়।

রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি আমার বিছানায় ঘুমাবে। আমি মদীনায় যাচ্ছি।'

হযরত আলী (রা) এ নির্দেশ পেয়ে খুব খুশি হলেন। যদিও তিনি জানেন, রাসূল (সা)-এর বিছানায় আজ শুয়ে থাকা মানে তাকে মরতে হবে। তবুও আলী (রা) এই মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুকে স্বাগত জানালেন। 'ভাবলেন, ক'জনের ভাগ্যেই বা এমন মধুর মৃত্যু জোটে!'

রাসূল (সা)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন হযরত আলী (রা)।

তার বুক একটুও কাঁপলো না।

কিছুক্ষণ পরে সত্যি সত্যি ঘরের ভেতর প্রবেশ করল কাফেররা। তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা রাসূল (সা)-কে।

রাসূল (সা)-কে পেলো না। দেখলো, রাসূল (সা)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন হযরত আলী (রা)।

কাফেররা ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো তাঁর দিকে।

কিন্তু মারলো না তাঁকে।

আল্লাহ পাক হেফাজত করলেন আলীকে।

রাসূল (সা)-কে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেল কাফেররা।

হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী।

তাঁর বীরত্বের কথা ছিলো সকলের মুখে মুখে। রাসূল (সা) তাঁকে ভালোবাসতেন খুব।

তিনি আলী (রা)-কে একখানি তরবারি দান করেছিলেন। সেই তরবারির নাম ছিলা 'জুলফিকার'। আর আলীকে উপাধি দিয়েছিলেন 'হায়দার'।

'জুলফিকার আলী হায়দার' বলতে আমরা হযরত আলীকেই বুঝি।

হযরত আলী ছিলেন এক অসীম সাহসী বীর।

উহুদের যুদ্ধ।

যখন মুজাহিদরা পরাজিত হয়ে একে একে সকলেই উহুদ থেকে পালাচ্ছে। তখন হযরত আলী (রা) পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন রাসূল (সা)-কে ঘিরে। তাঁর সাথে ছিলেন আরো কয়েকজন মুজাহিদ। রাসূল (সা)-এর গায়ে তাঁরা একটি আঁচড়ও লাগতে দেননি।

খন্দকের দিন।

আমর বর্মন পরে বার হলো। এরপর হুংকার দিয়ে বললো, 'যদি কারো সাহস থাকে তো এসো। আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে।'

হযরত আলী (রা) রাসূল (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূল (সা) নীরব।

আবার আমর হুংকার ছাড়লো।

হযরত আলী আবার রাসূল (সা)-এর দিকে তাকালেন।

রাসূল (সা) নীরব।

এভাবে কয়েকবার কাফেরটি ঔদ্ধ্যত প্রকাশ করলো।

রাসূল (সা) এবার আলী (রা)-কে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুমতি দিলেন।

আমর ঝাঁপিয়ে পড়লো আলীর ওপর। তার তরবারির আঘাতে ফেঁড়ে ফেললো আলীর ঢাল।

সাহসী আলী!

এতে তিনি একটুও ভয় পেলেন না। এবার তিনি হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমরের ওপর। এবং মুহূর্তেই তার তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করে ফেললেন আমরকে।

সপ্তম হিজরী।

সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ছিলো ইহুদীদের সুরক্ষিত অনেকগুলো দুর্গ; তন্মধ্যে নায়েম, কাসূস, সা'আব ইত্যাদি সহজেই জয় হলো। কিন্তু 'ওয়াতাহ' ও 'ফলালেম' নামক দু'টি দুর্গ দখলে আসল না। দুর্গ দুটির অধিপতি ছিল আরবের বিখ্যাত বীর মারহাব। রাসূল (সা) কিল্লাদ্বয় দখলের জন্যে প্রথমে পাঠালেন হযরত আবু বকর (রা)-কে! তারপর হযরত উমর (রা)-কে।'

তাঁরা ব্যর্থ হলেন। অতঃপর রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন, 'আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দিব, আল্লাহ তায়ালা যার হাতে বিজয় প্রদান করবেন।

সর্বশেষে, পরদিন রাসূল (সা) পাঠালেন হযরত আলী (রা)-কে।

এবং কি আশ্চর্য!

হযরত আলী কিল্লাগুলো দখল করে ফেললেন।

এভাবে তিনি সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন চতুর্থ খলিফা। পাঁচ বছর যাবত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

খলিফা হবার পরও এতোটুকুও বদলে যায়নি আলী (রা)-র চরিত্র। বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হলেন হযরত আলী (রা)।

আর স্বয়ং রাসূল (সা) বলেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিচারক আলী (রা)।

খলিফা হলেও হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মানুষর মতো। তাঁর জীবনে ছিলো না কোনো বিলাস-ব্যাসন। ছিলো না কোনো জাকজমক।

খলিফা হয়েও অভাব আর ক্ষুধা ছিলো তাঁর নিত্যসঙ্গী।

ক্ষুধার জ্বালায় হযরত আলী পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন।

ঘুমুবার জন্যে কিংবা বিশ্রামের জন্যে তার ছিলো না কোনো আরামদায়ক বিছানা। কখনো বা মাটির ওপর শুয়ে থাকতেন।

নিজে না খেয়ে থাকলেও অন্যের অভাব-কষ্টের প্রতি ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। অন্যের অভাব দূর করার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা) আলী (রা)-কে বলতেন, মু'মিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না। আর মুনাফিকরা ছাড়া তোমাকে কেউ হিংসা করবে না।

হযরত আলী (রা)!

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের জন্যে একটি প্রজ্জ্বল আগুনের ঢাল।◎

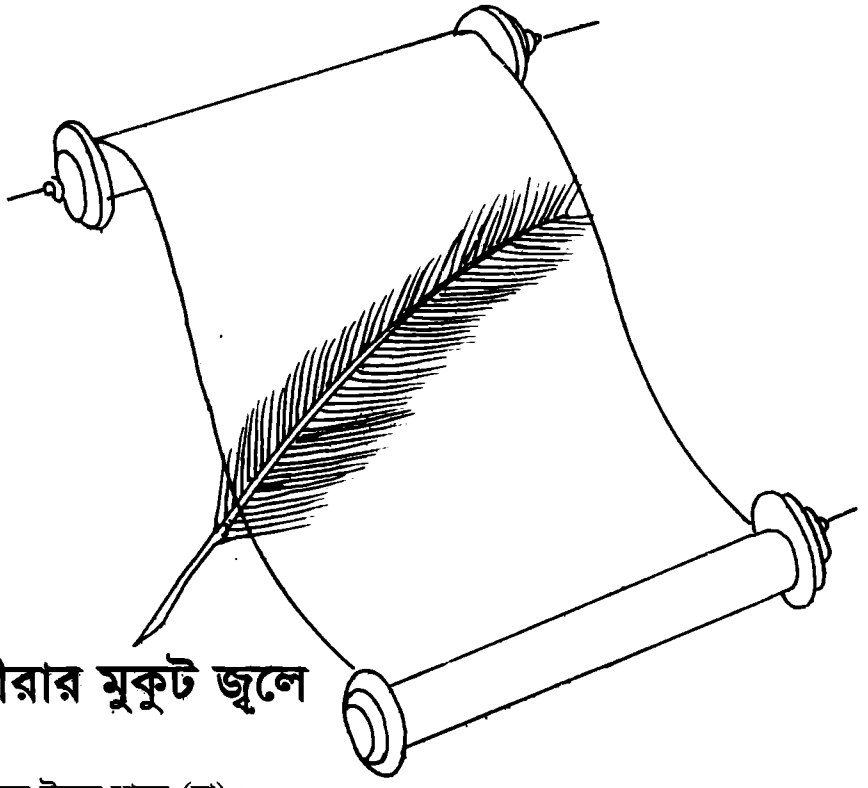

# হীরার মুকুট জ্বলে

আমর ইবনে হাযম (রা)।

খুবই সৌভাগ্যবান এক সাহাবী।

রাসূল (সা) তাঁকে ভালবাসতেন খুব।

তিনিও ছিলেন রাসূল (সা)-এর একান্ত বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে অন্যতম।

নাজরান।

নাজরানের বনু আল হারীস গোত্রে দীনের প্রকৃত জ্ঞানদান, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা, রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের শিক্ষা এবং যাকাত ও সাদকা আদায়ের জন্যে রাসূল (সা) একজন সুযোগ্য সাহাবীর তালাশ করছেন।

মুহূর্তেই দৃষ্টি পড়লো রাসূল (সা)-এর আমর ইবনে হযম (রা)-এর প্রতি।

হ্যাঁ! তিনিই এই কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি।

মানুষের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যাতে তারা দীন বুঝতে পারে। হজ্জের নিদর্শনসমূহ, সুন্নাত ও ফরজসমূহ এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন তা তাদেরকে অবহিত করবে।

হজ্জে আকবর সম্পর্কে জানাবে।

হজ্জ দুই প্রকার— হজ্জে আকবর ও হজ্জে আসগর। উমরা হচ্ছে হজ্জে আসগর।

মানুষকে একখানা ছোট্ট কাপড়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করবে। দুই কাঁধের ওপর আর একখানা কাপড় পেঁচানো থাকতে হবে।

মানুষকে একখানা কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে পরতে নিষেধ করবে যেন একটি ছিদ্র দিয়ে মাথাটি আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। মাথার পেছনের দিকে চুলের বেণী বাঁধতে নিষেধ করবে।

উত্তেজিত হয়ে গোত্র ও সম্প্রদায়কে আহবান জানাতে মানুষকে নিষেধ করবে। তাদের আহবান হবে কেবল আল্লাহর দিকে।

কেউ আল্লাহর দিকে না ডেকে গোত্র ও সম্প্রদায়ের দিকে আহবান জানালে তরবারি দিয়ে তার মাথাটি কেটে ফেলবে। যাতে, তাদের আহবান হয় এক আল্লাহর দিকে। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে অজু করতে নির্দেশ দেবে।

আল্লাহ যেমন মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত, গিরা পর্যন্ত দুই পা ধুইতে এবং মাথা মাসেহ করতে বলেছেন, সেইভাবে।

সঠিক সময় নামাজ আদায় করতে ও রুকু-সিজদা যথাযথভাবে করতে নির্দেশ দেবে।

সকালের নামাজ অন্ধকারে, জোহরের নামাজ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে, আসরের নামাজ সূর্য পৃথিবীর দিকে পেছনে ফিরলে এবং মাগরিবের নামাজ রাতের আগমন ঘটলে, আদায় করতে মানুষকে আদেশ দেবে। মাগরিবের নামাজ আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় এমন সময় পর্যন্ত দেরি করবে না।

রাতের প্রথমভাগে এশার নামাজ আদায় করতে বলবে। জুমআর নামাজের আজান হলে সব কাজ বন্ধ করে জুমআর নামাজে যেতে হবে। যাওয়ার আগে গোসল করতে বলবে।

গনীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর।

ভূ-সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত আল্লাহ ফরজ করেছেন। বৃষ্টি ও ঝরনার পানিতে সিক্ত ভূমির ফসলের এক-দশমাংশ এবং সেচযোগ্য ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ।

ব্যাস! রাসূল (সা)-এর সিদ্ধান্তের পালা শেষ। এখন কেবল হাযম (রা)-কে পাঠানোর কাজ বাকি।

হাযম প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

প্রস্তুতি নিচ্ছেন নাজরানে যাবার জন্য।

যাত্রার সময় দূরদর্শী মহান সেনাপতি রাসূল (সা) হাযমকে প্রদান করলেন একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্র। যাতে লেখা ছিল হাযমের দায়িত্বের পরিধি, কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা।

পত্রখানি ছিল ঐতিহাসিক।

কারণ সেটি রাসূল (সা)-এর লেখা। এই ঐতিহাসিক পত্রটির ভাষ্য ছিল এ রকম—

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'

এ আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর ঘোষণা, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।'

এটা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবন হাযমের প্রতি অঙ্গীকার যে– যখন তাঁকে ইয়ামন পাঠানো হচ্ছে। তিনি তাঁকে সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে ও মানুষের উপকার করে, তাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহর নির্দেশ মত সত্যসহকারে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করার।

তুমি মানুষের কল্যাণের সুসংবাদ দেবে এবং ভাল কাজের আদেশ করবে।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেবে, তাদের সামনে কুরআনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে এবং তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে।

কেউ পবিত্র অবস্থায় ছাড়া কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।

মানুষের অধিকার ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য তাদেরকে অবহিত করবে।

মানুষ হক বা সত্যের ওপর থাকলে তাদের প্রতি কোমল হবে, তারা অত্যাচারী হলে কঠোর হবে। কারণ, আল্লাহ অত্যাচার অপছন্দ করেন এবং অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন, 'সাবধান! অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ'।

মানুষকে জান্নাত ও জান্নাতের কাজসমূহের সুসংবাদ দেবে। তেমনিভাবে জাহান্নাম ও জাহান্নামের কাজগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

প্রতি দশটি উটে দুটি বকরী ও প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি গরু এবং প্রতি তিরিশটি গরুতে একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। প্রতি চল্লিশটি ছাগলের একটি বকরী দিতে হবে। এ যাকাত আল্লাহ মু'মিনদের ওপর ফরজ করেছেন। যে এর অতিরিক্ত দেবে, তা তার জন্য হবে কল্যাণকর।

যে কোন ইহুদী অথবা নাসারা নিষ্ঠাসহকারে মুসলমান হবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবে সে সত্যিকার মু'মিন বলে বিবেচিত হবে। মুমিনদের সমান অধিকার যেমন সে ভোগ করবে, তেমনি সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যও তার ওপর বর্তাবে। আর যে, ইহুদী ও নাসারা তার নিজ ধর্মে থেকে যাবে, তাকে কোনো রকম বাধা দেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও দাস নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ওপর পূর্ণ এক দীনার অথবা তার পরিবর্তে কাপড় দিতে হবে। যারা ঠিকমত দেবে তাদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর। যে তা দিতে অস্বীকার করবে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও মু'মিন সকলের শত্রু।

মুহাম্মাদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

ওয়াসসালামু আলাইহি ওয়ারাহ-মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দয়ার নবী (সা) যখন এই গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিয়ে হাযমকে নাজরানে পাঠান,তখন হাযমের বয়স কারুর মতে, 'মাত্র সতের বছর।'

কেউ বলেছেন, 'বিশ বছর।'

এত অল্প বয়সে, হাযম রাসূল (সা)-এর এই ঐতিহাসিক পত্রের অধিকারী হন। সেই সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নাজরানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের জন্য।

বয়স কোনো ব্যাপারই না।

ব্যাপার হলো, তিনি– অর্থাৎ হাযম ছিলেন সেই বিরল এক হীরকখণ্ড, যার অস্তিত্বই ছিল সূর্যসম।

এমনিই উজ্জ্বল, এমনি দীপ্তিময় যে, তার উজ্জ্বলতা ছিল নক্ষত্রের চেয়েও অনেক বেশি।

এখনো ইতিহাসের পাতায় জ্বলছে হাযম এবং রাসূল (সা)-এর এই চিঠি। হীরার মুকুটের মত।

ক্রমাগত জ্বলেই যাচ্ছে।◎

# মৌমাছির প্রহরায় শহীদের খুলি

হযরত আসেম (রা)।

হযরত আসেম (রা) ছিলেন একজন দক্ষ এবং কুশলী সাহসী যোদ্ধা। রাসূল (সা)-কে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণের চেয়েও। রাসূল (সা)-ও তাঁকে খুব মহব্বত করতেন। রাসূল (সা)-এর কষ্টে তিনি ব্যথিত হতেন। কেঁদে উঠতো তাঁর হৃদয়-মন।

কুরাইশদের মধ্যে এক নরাধম ব্যক্তি ছিল। নাম উকবা। সে ছিল যেমন নীচ, তেমনি হীন চরিত্রের।

রাসূল (সা)-কে কষ্ট দেয়াই ছিল তার প্রধানতম কাজ। কখনো বা ঝুড়ি ভরে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনা এনে রাসূল (সা)-এর ঘরের দরোজায় ফেলে যেত।

একবার তো এই পাষণ্ড উকবা রাসূল (সা)-কে মারতেই বসেছিল।

রাসূল (সা) একদিন সিজদাবনত ছিলেন।

কোথা থেকে ছুটে এলো উকবা। আর এসেই চেপে বসলো রাসূল (সা)-এর ঘাড়ের ওপর।

রাসূল (সা)-এর প্রাণ তখন যায় যায় অবস্থা।

আর একবার এই পাপিষ্ঠ উকবা মরা উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে রাসূল (সা)-এর স্কন্ধে চেপে দিয়েছিল।

এই বদবখত উকবা বদরে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো। রাসূল (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশে উকবাকে হত্যা করলেন দুঃসাহসী এক যোদ্ধা হযরত আসিম (রা)।

উহুদের প্রান্তর।

যুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে লড়ে যাচ্ছেন হযরত আসিম (রা)। এক সময় তিনি তীর ছুঁড়লেন সামনের দিকে।

অভ্রষ্ট লক্ষ্য। আসিমের তীর মুহূর্তে বিঁধে গেল পৌত্তলিক বাহিনীর সদস্য তালহার দুই পুত্র মুসাফি ও আল জুলাসের গায়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তারা।

মারাত্মক আহত অবস্থায় তাদেরকে নেয়া হলো তাদের মায়ের কাছে। মুসাফি-এর রক্তাক্ত শরীর কোলের ওপর তুলে তাদের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কে তোমাদেরকে এমন অবস্থা করলো?'

মুসাফি জবাবে বললো, 'মাগো! আমি শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি আমার প্রতি তীর ছুঁড়ে বলে উঠলো, এই নাও, আমি ইবনে আবিল আকলাহ।'

অর্থাৎ আসিম।

মুসাফির মা সুলাফা তার সন্তানদের হত্যাকারীর নাম শুনতেই চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি কোনোদিন আসিমের মাথা হাতে পাই তাহলে তার মাথার খুলিতে মদ পান করবো।'

কী জঘন্য ধরনের কথা!

আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা)-এর এক প্রিয় মানুষ– হযরত আসিম। যিনি সত্যের পথে লড়াই করেন।

যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালোবাসেন।

যিনি ইসলামকে ভালোবাসেন।

যিনি নিজের জান-মালকে উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাস্তায়।

তারই মাথার খুলিতে মদ পান করতে চায় কিনা এক পাপিষ্ঠা মহিলা!

কী আশ্চর্য!

দুঃসাহসের কথা তো বটেই। এমন জঘন্য ইচ্ছা কি মহান রাব্বুল আলামীন কখনো পূরণ হতে দেন?

কখনই না।

তার প্রমাণ হযরত আসিম।

হিজরী চতুর্থ সন।

হুজাইল গোত্রের একটি পানির কূপের নাম– আর রাজী। এই আর রাজীর পাশেই ঘটেছিল ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা।

আল আদল ও আল ফারাহ গোত্রের কিছু লোক এসে রাসূল (সা)-কে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু লোক মুসলমান হয়েছে। আপনার কিছু সঙ্গী আমাদের সাথে দিন, যারা আমাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করবেন, কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামী শরীয়ত শেখাবেন।'

রাসূল (সা) শুনলেন তাদের কথা। তারপর, তাদের সাথে পাঠালেন তাঁর ছয়জন সাহাবীকে। তারা হলেন— 'মারসাদ, খালিদ, আসিম, যায়িদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে তারিক।'

লোকগুলোর সাথে চললেন রাসূল (সা)-এর ছয়জন প্রাণপ্রিয় সাহাবী। তারা যাত্রা করলেন হিজাযের দিকে।

তারা যখন হুজাইল গোত্রের আররাজি কূপের কাছে পৌঁছুলো, তখনই ভেসে উঠলো লোকগুলোর আসল চেহারা।

তারা ছিল সুসজ্জিত এবং পূর্ব পরিকল্পিত।

আররাজি কূপের কাছে পৌঁছুতেই লোকগুলো চিৎকার করে হুজাইল গোত্রের সাহায্য কামনা করলো। আর মুহূর্তেই শিকারি বাঘের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর প্রিয় বান্দা সাহাবীদের ওপর।

প্রতিপক্ষে বিপুল জনসমুদ্র। তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো সাহাবীদেরকে। তারপর চালালো নির্লজ্জ পশুসুলভ আক্রমণ। তাদের সাথে সামান্য যে অস্ত্র ছিল, তাই তুলে নিলেন মুসলিম মুজাহিদরা।

হুজাইল গোত্রের লোকেরা বললো, 'আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। মক্কাবাসীদের হাতে তোমদেরকে তুলে দিয়ে

কিছু অর্থ লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করছি এবং তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদেরকে হত্যা করবো না। তোমরা আত্মসমর্পণ করো।'

জবাবে মারসাদ, খালিদ ও আসিম বললেন, 'আল্লাহর কসম! না, কক্ষণো না! আমরা কোনো মুশরিকের অঙ্গীকার ও চুক্তি কক্ষণো গ্রহণ করবো না।'

আসিম আবার চিৎকার করে বললেন, 'না! আমি মুশরিকের জিম্মায় যাব না। হে আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের খবর পৌঁছে দিন।'

হযরত আসিম!

এই দুর্যোগময় সময়ে আবৃত্তি করতে থাকলেন কবিতার কিছু সাহসী পংক্তি—

আমার কি যুক্তি থাকতে পারে, যখন আমি
একজন শক্তিমান, দক্ষ তীরন্দাজ ?
একটি ধনুকও আছে, আর তাতে আছে শক্ত ছিলা।
তার পিঠ থেকে উড়ে যায় লম্বা-চওড়া তীরের ফলা।
আর মৃত্যু ? তাই তো সত্য, আর জীবন—তাতো মিথ্যা।
আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাতো আসবে,
আর মানুষ, সে তো তাঁরই কাছেই ফিরে যাবে।
আমার মা হবেন নাক কাটা–
যদি না আমি তাদের সাথে লড়াই করি।

কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসিম কাফিরদের প্রতি তীর ছুঁড়ছিলেন। তীর শেষ হয়ে গেলে বর্শা। বর্শা ভেঙ্গে গেলে তুলে নিলেন তরবারি।

অসীম সাহসের সাথে তরবারি চালাতে লাগলেন দুঃসাহসী আসিম।

কিন্তু এভাবে, এই অসম যুদ্ধ আর কতক্ষণ!

ক্রমশ নেমে আসছে আসিমের সামনে পর্বতসমান এক স্বপ্নের মশাল। অর্থাৎ, শাহাদাত। শাহাদাতের একটু আগে তিনি হাত উঠালেন আল্লাহর দরবারে, 'হে আল্লাহ! দিনের প্রথম ভাগে আমি তোমার দীন রক্ষা করেছি। এখন দীনের শেষভাগে তুমি আমার দেহ রক্ষা করো।'

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় এক বান্দার এই আকুতি কবুল করলেন। আসিমের শাহাদাতের পর তিনি হেফাজত করলেন তার পবিত্র দেহটি।

কীভাবে ?

সে এক বিস্ময়কর ঘটনাই বটে।

আসিমকে হত্যা করার পর তারা চেয়েছিল, তার লাশটি আগুনে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে ফেলবে। আর তার মাথাটি কেটে বিক্রি করবে হারিস ও জুলাসের মা– সুলাফার কাছে। কারণ, এই মহিলা আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল।

মৃত্যুর সময়ে হযরত আসিম মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আরজ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! কোনো মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ না করে এবং আমিও যেন কোনো মুশরিককে স্পর্শ না করি।'

আল্লাহ পাক আসিমের এই আরজি কবুল করলেন। আসিমের হত্যার পর মুশরিকরা এগিয়ে এলো তাঁর রক্তাক্ত নিস্তেজ দেহের দিকে। তাদের চোখে-মুখে বন্য উল্লাস।

এই তো, এখনিই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবো।

কিন্তু না!

মুশরিকরা আসিমের লাশের দিকে এগুতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি এসে মুশরিকদেরকে এমনভাবে কামড়াতে শুধু করলো, যাতে করে তারা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগলো।

দিনের আলোতে তারা ব্যর্থ হয়ে ভাবলো, 'থাক। এখন নয়। রাতে এসে আসিমের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে সুলাফার কাছে বিক্রি করে দেব, আর আমরা আমাদের গোত্রের লোকদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে আসিমের দেহটি পুড়িয়ে ফেলবো।'

অপেক্ষা শুধু রাতের জন্য। আর তো মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা!

কিন্তু না।

রাত এলেও তারা সফলকাম হলো না। কারণ রাত আসতেই শুরু হলো বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে গোটা উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হলো। আর সেই প্লাবনের স্রোতে মুশরিকদের চোখের আড়ালে চলে গেল আসিমের লাশ।

বৃষ্টি থামার পর শত চেষ্টা করেও খুঁজে পায়নি মুশরিকরা আসিমের লাশ। সুতরাং তাদের ঘৃণ্য বাসনাও আর পূর্ণ হয়নি।

মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় বান্দাদেরকে এভাবেই সম্মানিত এবং হেফাজত করেন। যেমন করেছিলেন আসিম নামক মহাত্মার লাশটিকে মৌমাছির প্রহরায় এবং বৃষ্টি ও প্লাবনের মাধ্যমে।◎

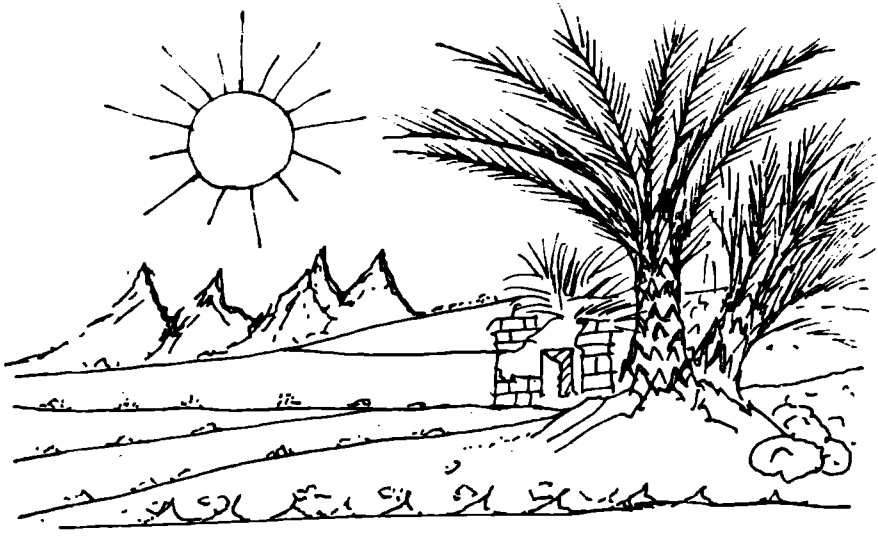

# সেই যে মানুষ সোনার মানুষ

তিনি বেড়ে উঠছেন।

বেড়ে উঠছেন জোছনার প্লাবিত আলোকে। জোছনা মানে– রাসূল (সা)-এর ভালোবাসায়।

রাসূল (সা)-এর পরশে।

নাম তার– উমাইর।

উমাইরও ছিলেন রাসূল (সা)-এর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। ছিলেন তিনি একান্তভাবে রাসূল (সা) প্রেমিক। তার সেই ভালোবাসায় ছিল না এতটুকু খাঁদ। ছিল না কেনো কুয়াশার বিন্দুরেখা।

কী এক মহৎ হৃদয় পরিচ্ছন্ন মানুষ!

ঠিকরে বেরোয় কেবল ঈমানের দ্যুতি। সত্যের রেশমি পালক দুলে দুলে হাওয়া দিয়ে যায় মিষ্টি মধুর। সেই যে মানুষ– সোনার মানুষ, তিনি কীভাবে সইবেন প্রাণপ্রিয় নবীর মন্দ সমালোচনা? কিংবা মিথ্যা অপবাদ? হোক না সমালোচনাকারী একান্ত আপনজন, কিংবা পিতা।

উমাইর! সাহসী এক সমুদ্র!

যিনি গর্জে উঠেন মিথ্যার বিরুদ্ধে।

ভেঙ্গে খান খান করে এগিয়ে যান আঁধার প্রাচীর।

সেই তিনি– তিনি কেমন করে সইবেন তার পালক পিতার মিথ্যাচার ; দুষ্ট প্ররোচনা ?

পালক পিতা– মানে জুলাস। জুলাসের কাছেই লালিত-পালিত হচ্ছেন উমাইর। তারই অন্ন-বস্ত্র আর আদর-স্নেহে বড় হচ্ছেন তিনি। তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি পরিতৃপ্ত।

কিন্তু তাই বলে রাসূল (সা) সম্পর্কে কটুক্তি ? তাও কি সইতে হবে ?

অসম্ভব! অসম্ভব এ অন্যায় দাবি।

জুলাস মানে– উমাইরের পালক পিতা। তিনি একবার রাসূল (সা) সম্পর্কে একটু খারাপ মন্তব্য করলেন।

সেখানে ছিলেন উমাইর।

ব্যাস! আর যায় কোথায় ? কথাটি দ্রুত, খুব দ্রুতগতিতে পৌঁছে দিলেন তিনি রাসূল (সা)-এর কানে।

শুনে রাসূল (সা)-ও হতবাক।

জুলহাস বলেছে এমন কথা! এমন তো নয় যে সে অমুসলিম নয়! কিংবা নয়– ঈমানদার!

তার মুখে শোভা পেল কেমন করে এমন অশ্রাব্য ভাষা!

কিছুটা ভাবলেন রাসূল (সা)।

তারপর!

তারপর ডেকে পাঠালেন জুলাসকে।

জুলাস জেনে গেছেন। উমাইর– তার পুত্রই রাসূল (সা)-কে বলেছে কথাটি। সঙ্গত কারণে তিনি ক্ষেপে আছেন ছেলের প্রতি। এমন স্পর্ধা! আমার খেয়ে, আমার পরে, আমারই নামে নালিশ! রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন জুলাস।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ!

অমান্য করার সাধ্য নেই তার।

খবরটি শুনেই তিনি ছুটলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। রাসূল (সা)-এর কাছে। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'যা কিছু শুনছি– তা কি সত্যি? মিথ্যা বলো না জুলাস!'

জুলাসের সামনে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা)।

কাঠগড়ায় জুলাস।

সত্য বলার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। হারিয়ে ফেলেছেন জুলাস, না কি ইচ্ছা করেই প্রদর্শন করছেন কপটতা?

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন আবারও, 'বলো, সত্যি করে বলো জুলাস!'

শিউরে উঠলো জুলাসের দেহ। তিনি তাকাতে পারছেন না রাসূল (সা)-এর দিকে।

থমথমে পরিবেশ।

গুমোট আবহাওয়া।

তারপরও, কীভাবে যে তিনি মিথ্যা বলে ফেললেন! বললেন, 'বিশ্বাস করুন হে দয়ার নবী (সা)। বিশ্বাস করুন– আমি এমন কথা বলিনি। কসম! এমন কথা আমি বলতে পারিনে কখনো।'

জুলাস দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠগড়ায়।

অপরপ্রান্তে এক মাত্র সাক্ষী–তারই প্রাণপ্রিয় এবং স্নেহধন্য পুত্র–উমাইর।

আর বিচারের আসনে বসে আছেন স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সা)।

জুলাস! হতভাগ্য জুলাস তখনো অস্বীকার করে চলেছেন কসম খেয়ে খেয়ে।

কিন্তু রাসূল (সা) বলে কথা!

তাঁর কাছে কি গোপন থাকে কোনো তথ্য, কিংবা কোনো সত্য? সেটাও কি সম্ভব? আদৌ নয়। তাঁর কাছে গোপনীয় বলে কিছুই নেই।

গোপন থাকলোও না।

সাথে সাথে ভেসে এলো আল্লাহর ওহী।

রাসূল (সা) পাঠ করলেন, পাঠ করলেন জুলাসের সামনে আল্লাহর নাজিলকৃত সূরা আত তাওবার ৭৪ নং আয়াত—

'তারা কসম খায়। কসম খায় যে, আমরা বলিনি। অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফুরী বাক্য। এবং অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে মুসলমান হবার পর। আর তারা কামনা করেছিল এমন কিছু– যা তারা পায়নি। আর এসব পরিণতি ছিল তারই যে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে।'

এরপর!

এরপর রাসূল (সা) পাঠ করলেন, 'বস্তুত এরা যদি তওবা করে নেয়, তা হবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তা না মানে, তাহলে তাদেরকে আজাব দেবেন আল্লাহ— বেদনাদায়ক কঠিন আজাব দুনিয়া এবং আখেরাতে।'

বিজ্ঞ জুলাস। বুদ্ধি আর বিবেচনায় পূর্ণ। তিনি বোঝেন সত্য-মিথ্যার ফারাক। বোঝেন ভাল-মন্দের বিষয়। তিনি বুঝে গেলেন আয়াতের মর্মার্থ। আর তখন— তখনই তিনি নুয়ে পড়লেন। বললেন কাতর স্বরে, 'রাসূল! হে প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) আমার! সত্যিই আমি মিথ্যা বলেছিলাম। এই তওবা করছি। তওবা করছি আমি আমার অন্যায় কৃতকর্মের জন্য। আর কক্ষণো মিথ্যা বলবো না। বলবো না এমন কোনো কথা– যাতে লজ্জিত হতে হয় এই আমাকেই।'

জয়ী হলেন জুলাসের পুত্র উমাইর।

মূলত জয়ী হলো সত্য। হ্যাঁ, সত্যই তো।

সত্যের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী!

এই হলেন সাহসী উমাইর।

সাহসী–কারণ, তিনি সত্যের জন্য, কেবল সত্যের জন্যই পরওয়া করেন নি পারিবারিক বন্ধন। পরওয়া করেন নি পালক পিতার রক্তচক্ষু।

সাহসী বলেই তিনি সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন যে এমন দিনে চুপ থাকা মানে, আমার দীনকে ধ্বংস করে দেয়া।

না, তা হতে পারে না। হতে পারে না কিছুতেই।

সত্যিই বিরল এক সাহসী ঈগল ছিলেন উমাইর (রা)।

কেমন সাহসী?

উদাহরণ দেয়া যায় অনেক। অনেক আছে তেমন ঘটনা।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা— দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন নির্মোহ। নির্মোহ ছিলেন যাবতীয় ভোগবিলাস থেকে।

যোগ্যতাই ছিল তখনকার দিনে একমাত্র মাপকাঠি। মাপকাঠি ছিল তাকওয়া এবং দীনদারী।

এসবের পরীক্ষায় পাস করতে হতো সাহাবীদেরকে।

হবে না?

তারাই তো সোনার মানুষ। সোনাও তো পরীক্ষা করতে হয়!

যাচাই করতে হয় বারবার।

উমাইরও ছিলেন এমনি এক পরীক্ষিত হীরকখণ্ড।

খলিফার আসনে তখন বসে আছেন অর্ধজাহানের শাসক খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)।

বিচক্ষণ খলিফা।

হিমসের ওয়ালী করে পাঠালেন তিনি উমাইরকে। ওয়ালী মানে– গভর্নর।

হিমসের গভর্নর হিসেবে উমাইরের ছিল অনেক দায়িত্ব। অনেক কাজ।

তিনি তো আর নিজেকে শাসক মনে করতেন না। নিজেকে মনে করতেন মানুষের একজন সাধারণ সেবক।

এক বছর কেটে গেল। কেটে গেল এতগুলো দিন। কিন্তু কোনো খবর নেই উমাইরের।

তিনি খবর পাঠান না খলিফার কাছে। পাঠান না কোনো ভাল-মন্দের সংবাদ। এমনকি পাঠান না কেন্দ্রীয় রাজকোষে কোনো খাজনা-যাকাত।

ব্যাপার কি? কী হলো উমাইরের ?

কিছুটা বিস্মিত খলিফা উমর (রা)। কিছুটা ক্ষুব্ধও। ভাবলেন একটু। তারপর ডেকে পাঠালেন সেক্রেটারীকে। বললেন, লেখ! লিখে পাঠাও উমাইরকে—

আমার এই চিঠি পৌঁছা এবং পাঠমাত্রই মুসলমানদের নিকট থেকে খাজনা এবং যাকাতসহ যা কিছু আদায় করেছো তা নিয়ে মদীনায় চলে আসবে।

যথাসময়ে খলিফার চিঠি পেয়ে গেলেন উমাইর।

খলিফার নির্দেশ বলে কথা।

তিনি দেরি করলেন না একটি মুহূর্ত। সাথে সাথে গুছিয়ে নিলেন তিনি। প্রস্তুত হলেন মদীনায় যাবার জন্য।

মদীনায় যাচ্ছেন হিমসের গভর্নর– উমাইর। সাথে নিলেন একটি চামড়ার থলিতে সামান্য কিছু পাথেয়। নিলেন পানির একটি পেয়ালা। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন ব্যাগটি।

তারপর!

তারপর বেরিয়ে পড়লেন উমাইর হিমস থেকে মদীনার পথে।

সাথে নেই কোনো উট, নেই ত্যাজি ঘোড়া, গাধা কিংবা অন্য কোনো বাহন।

পায়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। চলেছেন একজন মুসাফিরের বেশে।

মদীনা থেকে হিমসের দূরত্ব– কয়েকশ' মাইল। কম কথা নয়!

এই দীর্ঘ পথ তিনি পাড়ি দিচ্ছেন পায়ে হেঁটেই। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তিনি পৌঁছে গেলেন মদীনায়। খলিফার দরবারে।

এতোদিনে বদলে গেছে উমাইরের চেহারা। রোদ, ধুলোবালি আর দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে উমাইর তখন বিবর্ণ, বিবর্ণ এবং বিধ্বস্ত। মাথার চুলও হয়ে গেছে অনেক লম্বা।

দরবারে পৌঁছেই সালাম জানালেন উমাইর, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরুল মুমিনীন!'

খলিফা তাকালেন তার দিকে। পূর্ণ দৃষ্টিতে।

তাকিয়েই অবাক হলেন। একি! তোমার এ কী হাল হয়েছে উমাইর?

মৃদু হেসে জবাব দিলেন উমাইর। বললেন, 'আমার আবার কি হাল দেখলেন? আমি কি সুস্থ নই? না কি দুনিয়াদারীর ছোঁয়া লেগেছে আমার দেহে? আমি কি দুনিয়ার শিংদুটি ধরে টানাটানি করছি? কি মনে হয় আমীরুল মুমিনীন?'

খলিফা ভেবেছিলেন, এক বৎসর তো কম সময় নয়। এই এক বৎসরে আদায়কৃত প্রচুর সম্পদ সাথে করে আনবেন উমাইর। কিন্তু সে সব কিছু দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'হেঁটে এসেছো?'

'জি। হেঁটেই এসেছি আমীরুল মুমিনীন।'

'একটি বাহন দিয়ে কি কেউ তোমাকে সাহায্য করলো না?'

'কারো কাছে আমি বাহন চাইনি। আর কেউ তেমনভাবে এগিয়েও আসেনি।'

'তারা খুব খারাপ মুসলমান হয়ে গেছে!'

'আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে মানুষের গীবত করতে নিষেধ করেছেন। আমি তো তাদেরকে ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করতে দেখেছি।'

'হিমস থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ আননি? সেগুলো কি করেছ?'

'যা কিছু আদায় করেছি, সেখানেই জায়গামত খরচ করেছি। কিছু থাকলে তা অবশ্যই আপনার সামনে উপস্থিত করতাম হে আমীরুল মুমিনীন।'

উমাইরের সত্য উচ্চারণে মুগ্ধ হলেন উমর (রা)। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'উমাইরের নিয়োগ নবায়ন করা হোক।'

খলিফার নির্দেশ শুনে উমাইর বললেন, 'মাফ করবেন হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার অধীনে কিংবা অন্য কারো অধীনে ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কোনো দায়িত্ব পালন করবো না। কারণ, অপরাধ থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারিনি। সেখানে এক খ্রিস্টান জিম্মিকে আমি বলেছি, 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন'। হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে এমন কাজের জন্য সেখানে পাঠিয়েছিলেন? বলুন!...'

'উমাইর!' হযরত উমরের কণ্ঠে বিস্ময়।

দুঃসাহসী এবং নির্লোভী উমাইর খলিফার অনুমতি নিয়ে তারপর চলে গেলেন মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে। সেখানে, একটি জীর্ণ কুটিরে তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তার জীবনের বাকি সময়।

উমাইর এখানে আছেন নিজের ভেতর। সময় কেটে যায় তার আল্লাহর এবাদাতে।

খলিফা উমর (রা) তখনও নিশ্চিত নন। নিশ্চিত নন উমাইর সম্পর্কে। কখনো বা ভাবছেন, উমাইর ঠিক আছে তো, ঠিক আছে তো তার সেই টানটান দীনদারী, আমানতদারী এবং তাকওয়া?

একবার পরীক্ষা করা জরুরী।

একশ' দীনারসহ তিনি এবার একজনকে পাঠালেন উমাইরের সেই পূর্ণ কুটিরে।

তিনি হাজির হলেন খলিফার নির্দেশ মত।

সালাম জানালেন উমাইরকে। উমাইর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে আসছেন?'

'মদীনা থেকে।'

'আমীরুল মুমিনীনকে কেমন ছেড়ে এসেছেন?'

'একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসেবে।'

'আমীরুল মুমিনীন কি এখন আর 'হদ' কায়েম করেন না?'

'করবেন না কেন? তিনি তাঁর এক ছেলেকে সম্প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি দান করেছেন। ছেলেটি মারা গেছে।'

'আল্লাহ তুমি উমরকে সাহায্য কর। তোমার ভালোবাসা ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই নেই।'

লোকটি উমাইরের ঘরে তিনদিন ছিলেন। ছিলেন অতিথি হিসেবে।

এই তিনদিন শুধু যবের রুটির কিছু টুকরো চিবিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন।

লোকটি বললেন, 'উমাইর! এ তিনদিন আপনি তো আমাকে প্রায় অভুক্তই রেখেছেন।'

তারপর দীনারগুলো বার করলেন তিনি। বললেন, 'এই দীনারগুলো নিন।'

দীনার দেখামাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন উমাইর। বললেন, 'এসব আমার প্রয়োজন নেই!'

দীনারের থলিটা তিনি ঠেলে দিলেন লোকটির দিকে।

ভেতর থেকে উমাইরের স্ত্রী বললেন, 'আপনার প্রয়োজন না থাকলে যাদের প্রয়োজন আছে– তাদেরকে দিয়ে দিন।'

উমাইর বললেন, 'এগুলোর ব্যাপারে কিছু করার কোনো অধিকার আমার নেই।'

একথা শোনার পর তার স্ত্রী ভেতর থেকে ওড়না ছিঁড়ে কয়েকটি টুকরো করলেন। তারপর দীনারগুলো ভাগ করে সেই কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে আশ-পাশের শহীদদের সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

পরে খলিফা তাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দীনারগুলো কি করেছো উমাইর?'

উমাইর জবাবে বললেন, 'সেগুলো আমি আমার আখেরাতের প্রয়োজনে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

এই হলেন হযরত উমাইর (রা)।

হযরত উমাইর ছিলেন দুনিয়ার বিষয়ে প্রকৃত অর্থেই উদাসীন এক সত্যপুরুষ। বিলাসিতা তো দূরে থাক– জীবনের জন্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিও ছিল না তার এতটুকু লোভ কিংবা আগ্রহ।

অন্ধকার কিংবা আবর্জনা– না, কখনোই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।◎

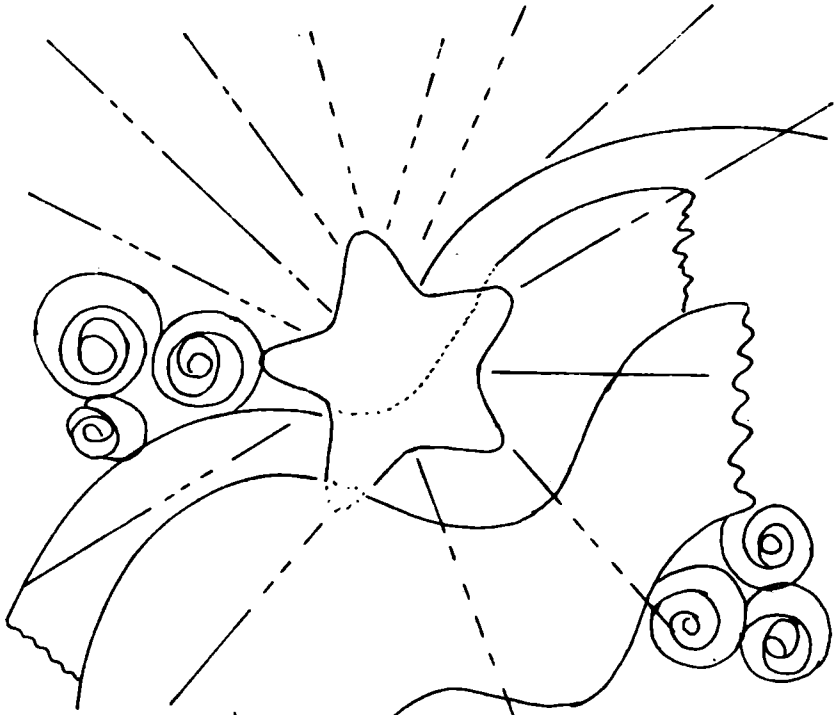

# রহস্যের চাদর

আবু হুরাইরা (রা)। খুব পরিচিত একটি নাম।

আবু হুরাইরা (রা)-র নামের সাথে পরিচিত নয় অন্তত এমন কোনো শিক্ষিত মুসলমান পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে যারা রাসূল (সা)-এর হাদীস পড়েন, হাদীসের সাথে কম-বেশি পরিচিত তারা সবাই আবু হুরাইরা (রা)-র নামের সাথেও পরিচিত।

কারণ কি ?

কারণটা হলো, আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন এমন একজন জ্ঞানী সাহাবী, যিনি রাসূল (সা)-এর বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরা (রা), নামটি শুনতে বেশ ভাল লাগে। নামটির সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়– বিড়াল শাবকওয়ালা। আবার যারা আর একটু মজা করে অর্থটা প্রকাশ করতে চান– তারা বলেন, বিড়ালের পিতা।

তার প্রকৃত নাম কিন্তু আবু হুরাইরা নয়।

এটা তার ডাক নাম।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হলো ?

সে এক মজার কাহিনী বটে।

খুব ছোট্টকালে তিনি দারুণ পছন্দ করতেন বিড়াল। ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া সকল সময়ে তিনি বিড়ালছানাকে কোলে পিঠে রাখতেন। তার এই বিড়াল প্রিয়তার দৃশ্য দেখে চারপাশের সবাই পুলকিত হতেন।

আনন্দ পেতেন।

আর তারা সেখান থেকেই তাকে ডাকতে শুরু করলেন, 'আবু হুরাইরা' বলে।

ব্যাস! আর যায় কোথায়?

একমুখ থেকে অন্যমুখ– এভাবেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন আবু হুরাইরা (রা) নামে। আবু হুরাইরা (রা)-র প্রকৃত নাম কি ছিল?

তার আসল নাম ছিল আবদু শামস।

এটা ছিল তার ইসলাম গ্রহণের আগের নাম।

আবদু অর্থ দাস। আর শামস অর্থ সূর্য বা অরুণ। অর্থাৎ তার নামের মানে দাঁড়ায়– 'অরুণ দাস'।

ছি! এক জঘন্য ব্যাপারই বটে!

ইসলাম গ্রহণের সময়ের কথা।

তিনি সাক্ষাত করতে এলেন রাসূল (সা)-এর সাথে।

রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আবদু শামস।'

রাসূল একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আবদু শামস নয়। আজ থেকে তোমার নাম হবে– আবদুর রহমান।'

তিনি রাসূল (সা)-এর দেয়া এই নামটিই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করলেন। কিন্তু করলে কি হবে? সেই ছোটকালের ডাক নাম– আবু হুরাইরা (রা)-ই শেষ পর্যন্ত টিকে গেল এবং তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন এই নামেই।

আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং ধৈর্যশীল।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি চলে আসেন মদীনায়। নবীর কাছে। তারপর থেকেই শুরু হয় তার জীবনের কঠিন সংগ্রাম।

তিনি রাসূল (সা)-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন।

সব সময় তাঁর খেদমত করতেন। তাঁর সাহচর্যে কাল কাটাতেন।

রাতদিন পড়ে থাকতেন মদীনার মসজিদে। রাসূল (সা)-এর কাছে সবক নিতেন। নিতেন তালিম ও তারবিয়াত।

আপন বলতে তখন একমাত্র মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আবু হুরাইরা (রা) তাঁর বৃদ্ধা মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পরও মা ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু হতাশ হননি আবু হুরাইরা (রা)।

তিনি সব সময় মাকে দীনের দাওয়াত দিতেন। তখনো তার মা ছিলেন অন্ধবিশ্বাসে মাতোয়ারা। কিছুতে ছাড়তে নারাজ বাপ দাদার ধর্ম–পৌত্তলিকতা।

আবু হুরাইরা (রা) তাকে বার বার বুঝান–

'দেখুন মা, একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামই সত্য। আর সব মিথ্যা, মিথ্যা এবং অগ্রহণযোগ্য।'

কে শোনে কার কথা!

মায়ের ঐ একই জিদ, না আমি বাপ দাদার ধর্ম ছাড়তে পারবো না কখনো।

তবুও হাল ছাড়েন না আবু হুরাইরা (রা)।

বার বার তিনি তাঁর মাকে আহবান জানান আল্লাহর দিকে।

রাসূল (সা)-এর দিকে।

ইসলামের দিকে।

সত্যের দিকে।

আর তার মা বার বারই প্রত্যাখ্যান করে যান ছেলের এই সত্য আহবান।

মায়ের আচরণে এবং তার একগুঁয়েমিতে খুব কষ্ট পান আবু হুরাইরা (রা)।

তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

একদিন আবার তিনি মাকে কাছে, খুব কাছে ডেকে নিয়ে একান্ত যত্নের সাথে বললেন, 'মাগো! আল্লাহর পথই সত্য পথ। ফিরে আসুন। ফিরে আসুন সেই সত্যের পথে।

আল্লাহর পথে।

রাসূল (সা)-এর পথে।

ইসলামের পথে।

এই পথেই আছে একমাত্র কল্যাণ। আছে শান্তি এবং সুখ।'

এবারও ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁর মা। আর সেই সাথে রাসূল (সা) সম্পর্কে বললেন অনেক মিথ্যা এবং খুব বাজে কথা।

মায়ের এসব কথা শুনে দু'কান গরম হয়ে গেল আবু হুরাইরা (রা)-র।

তাঁর প্রিয় রাসূল (সা) সম্পর্কে কটুক্তি!

এত বড় ধৃষ্টতা!

তবুও মা বলে কথা। শ্রদ্ধেয় এবং গুরুজন বলে কথা।

তিনি অতি কষ্টে ধৈর্যধারণ করলেন। করলেন বটে, কিন্তু তাঁর দু'চোখ বেয়ে ক্রমাগত ঝরে পড়তে থাকলো বেদনার অশ্রু।

ছল ছল নয়নে তিনি ছুটে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে।

রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন? কি হয়েছে আবু হুরাইরা (রা)?'

আবু হুরাইরা (রা) ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি সব সময় মাকে ইসলামের দাওয়াত দেই। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি অস্বীকার করেন। আজও আমি তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। তিনি তো কবুল করলেনই না, বরং আপনার সম্পর্কে বললেন, এমন কিছু কথা, যা শুনে আমি খুব বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে গেছি। তাঁর কথাগুলো আমাকে দারুণভাবে কষ্ট দিয়েছে। হে রাসূল! আপনি মেহেরবানী করে আমার মাকে সুপথে আনার জন্য একটু দোয়া করুন। তাঁর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

নবীজী খুব শান্তভাবে শুনলেন প্রিয় সাহাবী আবু হুরাইরা (রা)-র কথা এবং দোয়া করলেন তার মায়ের জন্য।

তারপর আবু হুরাইরা (রা)-র দিকে মুখ ফিরিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন রাসূল, 'যাও। এবার তুমি বাড়ি ফিরে যাও'।

বাড়ি ফিরে এলেন আবু হুরাইরা (রা)। ফিরে দেখেন ঘরের দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ করা। ঘরের মধ্যে পানি পড়ার শব্দও তিনি শুনতে পেলেন। বুঝলেন, ঘরের ভেতর মা আছেন। তিনি পেছনের রাগ, দুঃখ ক্ষোভ চেপে রেখে মা, মা বলে ডাক দিলেন।

তাঁর ডাক শুনতেই ভেতর থেকে জবাব ভেসে এলো,

'একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

একটু পরে মা তাঁকে ভেতরে ডাকলেন।

তারপর!

তারপর আবু হুরাইরা ঘরে প্রবেশ করতেই খুব প্রাণস্পর্শীভাবে উচ্চারণ করলেন মা—

'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

মায়ের এই সত্য উচ্চারণে আনন্দে গলা ধরে এলো আবু হুরাইরা (রা)-র।

খুশিতে তাঁর চোখ দু'টো ভিজে গেল।

মানুষ যেমন দুঃখ কষ্টে কাঁদে, তেমনি কাঁদে চরম আনন্দেও।

আবু হুরাইরা (রা)-ও কাঁদছেন।

তবে তাঁর এই কান্নাটা কষ্টের নয়। নয় কোনো দুঃখের।

এই কান্নাটা তার চরম সুখ আর আনন্দের।

কাঁদতে কাঁদতেই তিনি আবার ছুটে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে। বললেন, 'হে রাসূল! সুসংবাদ! সুসংবাদ আমার জন্য। আমার মায়ের জন্য। আমার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন।"

রাসূল (সা)-কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন আবু হুরাইরা (রা)। ভালোবাসতেন গভীরভাবে। সেই ভালোবাসার মধ্যে ছিল না কোনো খাঁদ। ছিল না কোনো ফাঁক ফোকর। তার কথা শুনে আবারও মুচকি হাসলেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূল (সা)-এর দিকে অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন আবু হুরাইরা (রা)। একবার নয়, বার বার। তিনি তাকিয়ে থাকতেন রাসূল (সা)-এর পবিত্র নূরানী চেহারার দিকে।

এত যে দেখতেন, তবুও তাঁর পিপাসা মিটতো না।

তিনি বলতেন, রাসূল (সা)-এর চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও দীপ্তিমান কোনো কিছু আমি দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের কিরণ ঝলমল করতে থাকে।

আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত। রাসূল (সা)-এর প্রতি ছিলেন নিবেদিত। আর জ্ঞানের প্রতি ছিলেন সর্বদা তৃষ্ণার্ত।

জ্ঞান অর্জন আর জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আবু হুরাইরা (রা) তাঁর জীবনকে করেছিলেন উৎসর্গ।

তিনি নিজের জন্য যেমন জ্ঞান আহরণকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন, তেমনি অপরের জন্যও ছিল তাঁর সেই রকম পরামর্শ।

আবু হুরাইরা (রা)-র ছিল অসাধারণ স্মৃতি শক্তি।

রাসূল (সা)-এর কাছে যা শুনতেন তাই তিনি মনে রাখতে পারতেন। তারপরও তার যেন কোথাও কোনো খটকা থেকেই যেত। এজন্য একবার তিনি রাসূল (সা)-কে আরজ করলেন, 'হে রাসূল! আমি আপনার অনেক কথাই শুনি। কিন্তু সেসব কথার সবটাই আমার মনে থাকে না। ভুলে যাই অনেক কিছু। আমার স্মরণ শক্তির জন্য একটু দোয়া করে দিন। দোয়া করুন হে প্রাণপ্রিয় রাসূল আমার!'

রাসূল বুঝলেন, আবু হুরাইরার জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল। তিনি খুব খুশি হলেন। জোছনার মত ছড়িয়ে পড়লো নবীজীর মিষ্টি মধুর হাসির ছটা। বললেন, 'তোমার চাদরটি মেলে ধর।'

আবু হুরাইরা মেলে ধরলেন।

এরপর রাসূল (সা) বললেন, 'চাদরটি তোমার বুকের সাথে চেপে ধর।' তিনি তাই করলেন।

এবং কী আশ্চর্য!

এরপর থেকে তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে যা কিছু শুনতেন, তাই মনে রাখতে পারতেন। ভুলে যেতেন না সামান্য কিছুও।

আবু হুরাইরার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব – তিনি হাজার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এত হাদীস!

বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

আবু হুরাইরা বলতেন,

'তোমরা হয়তো মনে করেছো আমি খুব বেশি হাদীস বর্ণনা করি। আমি ছিলাম রিক্ত, নিঃস্ব, দরিদ্র। পেটে পাথর বেঁধে সর্বদা রাসূলুল্লাহর সাহচর্যে কাটাতাম। আর মুহাজিররা? তারা ব্যস্ত থাকতো তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য।'

তিনি নিজেই বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ব্যতীত আর কেউ আমার থেকে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী নেই। আর তাও এ জন্য যে, তিনি হাদীস লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।'

রাসূল (সা)-এর সাহচর্য আর তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য আবু হুরাইরা (রা) সর্বদা থাকতেন উন্মুখ।

তিনি এটিকে জীবনের প্রথম এবং প্রধান কাজ বলে মনে করতেন।

জীবন-জীবিকার জন্য অন্য কোনো কাজ করার মত ফুরসতও তিনি পেতেন না। সুতরাং তাকে সহ্য করতে হতো ক্ষুধার কষ্ট।

কত বেলা আর কতদিন যে তিনি না খেয়ে কাটিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আবু হুরাইরা (রা)-র মত এত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কষ্ট সেই সময় আর কেউ সহ্য করেননি। কেমন ছিল কতটা ছিল সেই ক্ষুধার যন্ত্রণা ?

এ সম্পর্কে তারই মুখ থেকে শুনবো একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী। তিনি বলছেন–

মাঝে মাঝে আমি এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তাম যে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো সাহাবীর কাছে কুরআনের কোনো একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। আমার উদ্দেশ্য থাকতো, হয়তো তিনি আমার এই অবস্থা দেখে আমাকে সংগে করে তার বাড়িতে নিয়ে খাওয়াবেন।

একদিন আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম।

ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে তারপর বসে পড়লাম সাহাবীদের যাতায়াতের পথের ওপর।

হযরত আবু বকর (রা)-কে যেতে দেখলাম। তাঁকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

মনে করেছিলাম তিনি সাথে করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে খাওয়াবেন।

কিন্তু তিনি ডাকলেন না।

তারপর এলেন উমর ইবনে খাত্তাব (রা)।

তাঁকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনিও কিছু বললেন না।

সবশেষে এলেন দয়ার নবীজী (সা)।

তিনি আমার প্রচণ্ড ক্ষুধার কষ্টটা অনুভব করলেন। বললেন, 'আবু হুরাইরা (রা)?'

বললাম, 'লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' একথা বলে পেছনে পেছনে আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম।

রাসূল বাড়িতে ঢুকে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধ কোথা থেকে এসেছে?'

জবাবে জানলেন তাঁর জন্য একজন সাহাবী পাঠিয়েছেন।

রাসূল (সা) বললেন, 'আবু হুরাইরা, তুমি আহলুস সুফফার কাছে গিয়ে তাদেরকে একত্রিত কর।'

একথা শোনার পর আমি মনে মনে বললাম, মাত্র এক পেয়ালা দুধ, আহলুস সুফফার এতগুলো লোকের কি হবে?

আমি চাচ্ছিলাম প্রথমে আমি পেট ভরে পান করি, তারপর তাদের কাছে যাই।

যা হোক, আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে ডেকে একত্রিত করলাম। তারা সবাই এলে রাসূল আমাকে বললেন, 'আবু হুরাইরা, তুমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের হাতে দাও।'

আমি এক এক করে সবার হাতে দিলাম এবং তারা সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হলেন।

তারপর পেয়ালাটি হাতে নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে এলাম।

তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি আর আমিই বাকি আছি।'

এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি পান কর।'

আমি পান করলাম।

তিনি বললেন, 'আরো পান কর।'

'আমি আরো পান করলাম। এভাবে তিনি বার বার পান করতে বললেন, আর আমি বার বার পান করতে থাকলাম। শেষে আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তার শপথ, আমি আর পান করতে পারছিনে।'

অতঃপর রাসূল (সা) পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বাকিটুকু পান করলেন।

এই হতদরিদ্র মানুষটি একদিন আল্লাহর রহমতে সম্পদশালীতে পরিণত হয়েছিলেন।

হয়েছিলেন পেটে ভাতে খেটে খাওয়া সামান্য মজুর থেকে মদীনা ও বাহরানের শাসক।

কী আশ্চর্য ঘটনা!

মজুরই হন আর শাসকই হন– আবু হুরাইরা ছিলেন ন্যায়ের পথে সর্বদা নির্ভীক এক সৈনিক। শাসক হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

তাঁর ছিল না কোনো আড়ম্বর।

ছিল না কোনো জাকজমক।

ছিল না বাহাদুরি বা শক্তির কোনো বড়াই।

বরং তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে থাকতেন প্রকম্পিত।

মদীনার শাসক থাকা অবস্থায় তিনি নিজের পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বাড়িতে আনতেন। এখনকার সময়ে যা কল্পনাও করা যায় না।

অসম্ভব জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিনয় আর উদারতার জীবন্ত প্রতীক ছিলেন আবু হুরাইরা (রা)।

তিনি দিনে রোযা রাখতেন আর রাতের প্রথম ভাগ ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। এরপর ডেকে দিতেন স্ত্রীকে। তিনি রাতের দ্বিতীয় ভাগ ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। তার স্ত্রী ডেকে দিতেন তাদের কন্যাকে। তিনি রাতের বাকি অংশ ইবাদাত করতেন। এভাবে সারারাত চলতো আবু হুরাইরা (রা)-র বাসায় আল্লাহর ইবাদাত।

আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল।

তার দানশীলতা সম্পর্কে বহু ঘটনার উল্লেখিত আছে।

কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল তার শিক্ষা এবং জ্ঞান। যার কোনো তুলনা হয় না।

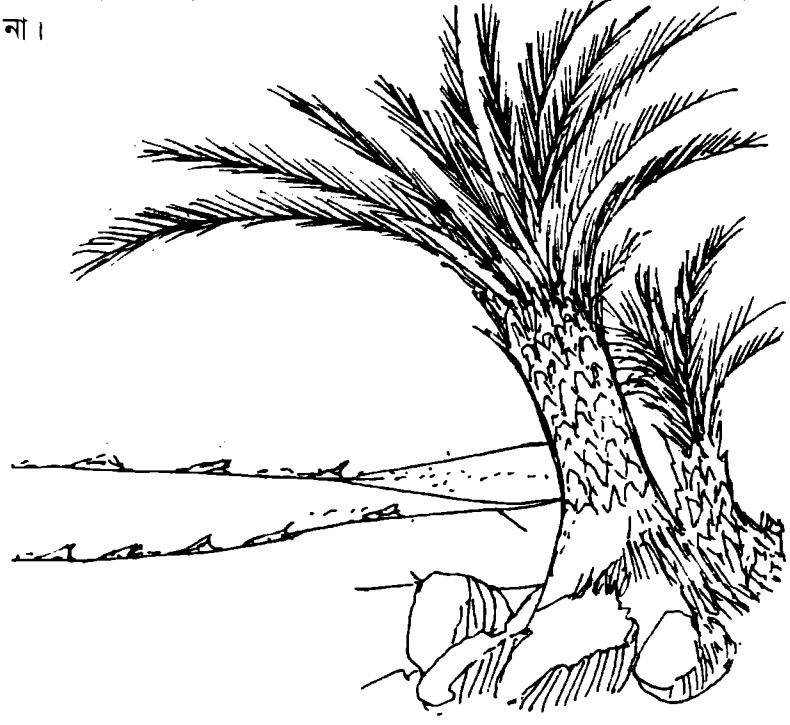

তার সমগ্র জীবনটাই ছিল জ্ঞানের এক জ্বলন্ত প্রদীপ।

তিনি নিজে যেমন ছিলেন নম্র ভদ্র এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, অন্যদেরকেও তিনি তেমনি জীবন গঠনের জন্যে সব সময় উপদেশ দিতেন।

উপদেশ দিতেন পিতা, মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহারের জন্যে।

এই অসাধারণ ব্যক্তিটি যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে কেবল কেঁদেছেন।

তাঁর কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য আমি কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি, দীর্ঘ ভ্রমণ ও স্বল্প পাথেয়র কথা চিন্তা করে। যে রাস্তাটি জান্নাত কিংবা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি এখন সেই রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। জানিনে, আমি সেই দুটি রাস্তার কোনটাতে যাব।'

এই হলেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)।

জ্ঞান সমুদ্রে যিনি ছিলেন এক পরিভ্রমণশীল দুঃসাহসী নাবিক।

আবু হুরাইরা (রা) আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আছে তাঁর বর্ণিত হাজার হাজার হাদীস। আর এইসব হাদীসকে আবৃত করে রেখেছে যেন সেই রহস্যের চাদরটি।

যে চাদরে ছিল স্বয়ং দয়ার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর অপরিসীম ভালোবাসার দান।

আবু হুরাইরা (রা)-র নামটি উচ্চারণ করতেই ভেসে ওঠে তার বর্ণিত অসংখ্য হাদীস।

আর সেই সাথে ভেসে ওঠে তাঁর জ্ঞানের চাদরটি।

মনে হয়, সেই রহস্যের চাদরের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে হীরকোজ্বল নক্ষত্রের মুখ। এবং সেই চাদরের ওপর যেন উড়ে এসে বসছে লক্ষ কোটি বেহেশতী আবাবিল।◎

# পড়শীর চোখে ক্রোধের আগুন

নবী মুহাম্মাদ (সা)।

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়াছিলেন রহমতস্বরূপ।

সেই জাহেলিয়াতের যুগেও, মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনের প্রথম দিকে সবাই তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং চরিত্রবান বলে জানতো। তাঁর সম্পর্কে কারুর কোনো অভিযোগ ছিল না। ছিল না কোনো নালিশ।

কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর সম্পূর্ণ পালটে গেল আরবের অবস্থা।

এমন কি, সেই কাছের মানুষ, আপন গোত্র– কুরইশরাও ঘুরে দাঁড়ালো মুহূর্তে। ঘুরে দাঁড়ালো নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দিক থেকে।

কোথায় হারিয়ে গেল তাদের এতদিনের সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা আর হৃদয়ের সেই আকুতি।

ভালোবাসার স্থানে কুরাইশদের মনে জন্ম নিল হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ এবং পশুসুলভ ক্রোধ।

কিন্তু কেন ?

কেন তারা রাসূল (সা)-এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন হিংস্র হয়ে উঠলো?

কারণ একটাই। তিনি অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (সা) তাদেরকে ডাকেন আল্লাহর দিকে।

সত্যের দিকে।

আলোর দিকে

আর তাদেরকে দূর করতে বলেন মনের যত কালিমা। দূর করতে বলেন সকল ভ্রান্তি, সকল পাপ এবং সকল প্রকার অন্যায়।

রাসূল (সা) তাদেরকে আহবান জানালেন, তোমরা মিথ্যার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করো।

একমাত্র ইসলামই সত্যের পথ দেখাতে পারে।

তোমরা যে ধর্মের উপাসক, সেটা আসলে কোনো ধর্ম নয়।

সুতরাং এসো আল্লাহর পথে।

এসো রাসূল (সা)-এর পথে।

এসো দীনের পথে।

ব্যাস! আর যায় কোথায় ?

রাসূল (সা)-এর এই সত্যের আহবানে ক্ষেপে উঠলো কুরাইশরা। নবীজীর একান্ত পড়শীরা। তাঁর আপনজনেরা। কী, এত্তবড় কথা!

সেদিনের মুহাম্মাদ কিনা আমাদের শেখাতে আসে সত্যের পথ।

শেখাতে আসে সত্য-মিথ্যা! আর কী দুঃসাহস! আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে কিনা ইসলাম গ্রহণ করতে বলে!

শুধু এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। রাসূল (সা)-এর ওপর চালালো তারা নানাধরনের অত্যাচার আর নিপীড়ন। কী বর্বর, কী জঘন্য ছিল তাদের সেই আক্রমণের ভাষা!

কুরাইশদের মধ্যে যারা রাসূল (সা)-কে কষ্ট দিত তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আর তার স্ত্রী উম্মে জামিলও ছিল এক সাংঘাতিক মহিলা। সে কাঁটা সংগ্রহ করে এনে ছড়িয়ে দিত রাসূল (সা)-এর চলার পথে। মহান রাব্বুল আলামীন এই দু'জন সম্পর্কে সূরা লাহাব নাযিল

করেন। বলেন, 'ভেঙে গিয়েছে আবু লাহাবের দুই হাত আর সে ব্যর্থ হয়েছে। তার সম্পদ ও অর্জিত কোনো কিছুই তার কাজে আসেনি। অবশ্যই সে শিখা বিশিষ্ট আগুনে নিক্ষিপ্ত এবং তার সাথে তার স্ত্রীও যে কাষ্ঠ বহনকারিনী। তার গলায় থাকবে খেজুর ছালের রশি।'

আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী শুনলো যে তাদের ব্যাপারে কুরআনে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। শুনেই আবু লাহাবের স্ত্রী একটি পাথরখণ্ড তুলে নিয়ে ছুটলো রাসূল (সা)-এর দিকে।

রাসূল (সা) তখন আবু বকরের (রা) সাথে কা'বা শরীফের পাশে মসজিদে হারামে বসে ছিলেন।

সেখানে এই ক্রুদ্ধ মহিলা পৌঁছুতেই আল্লাহ পাক তার চোখ থেকে রাসূল (সা)-কে দেখার জ্যোতি তুলে নিলেন।

আর কী আশ্চর্য!

আবু লাহাবের স্ত্রী সত্যি সত্যিই রাসূল (সা)-কে দেখতে পেলো না। দেখলো কেবল আবু বকর (রা)-কে।

আবু বকর (রা)-কে দেখে সে ক্ষীপ্ত হয় বললো, 'হে আবু বকর! তোমার সাথী মুহাম্মাদ কোথায়? সে নাকি আমার নিন্দা করে? আল্লাহর শপথ, তাকে পেলে এই পাথর আমি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতাম।'

একথা বলে ফুঁসতে ফুঁসতে সে চলে গেল।

আবু বকর (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল (সা)! আপনি কি মনে করেন সে আপনাকে দেখতে পায়নি?'

রাসূল (সা) বললেন, 'না। সে আমাকে দেখতে পায়নি। কারণ আমাকে দেখার মত আলো আল্লাহ পাক তার চোখ থেকে তুলে নিয়েছিলেন।'

উকবা ইবনে আবু মু'য়িত ও উবাই ইবনে খালফ উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিল। তাদের ছিল গলায় গলায় মিল।

একবার উকবা রাসূল (সা)-এর মজলিশে বসেছিল। মন দিয়ে শুনেছিল সে রাসূল (সা)-এর কথা।

উবাই এ কথা জানতে পেরে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেল। উকবাকে সে বললো, 'তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর মজলিশে বসেছো এবং তার কথা শুনেছো তা কি আমি জানিনে বলে মনে করছো? আমি তোমার সবই জানি, বুঝেছো!'

তারপর উবাই উকবাকে নির্দেশ দিল, 'তুমি যদি মুহাম্মাদ-এর (সা) মজলিশে গিয়ে থাকো এবং তার কথা শুনে থাকো আর তার মুখে যদি থুথু নিক্ষেপ না করো, তাহলে তোমার মুখ দেখা আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে।'

সত্যি সত্যিই উবাই–এর এ কুপরামর্শে উকবা প্রিয়নবী (সা)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল।

কী বদনসীব উকবার!

এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন নাযিল করেন, 'যেদিন জালিম নিজের আঙ্গুল কামড়ে অনুশোচনা করবে এবং ভাববে– হায়! আমি যদি রাসূল (সা)-এর সহযোগিতা করতাম! হায়! আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! সে তো আমাকে বিপথগামী করে দিয়েছে আমার কাছে পথ নির্দেশ আসার পর। বস্তুত শয়তান মানুষকে হেয় করতে খুবই সিদ্ধহস্ত।'

এভাবেই সারাক্ষণ ধিকি ধিকি জ্বলতো রাসূল (সা)-এর পড়শীর চোখে ঘৃণার আগুন।

এতো মাত্র দুটো নমুনা।

রাসূল (সা)-কে কষ্ট দেবার এমন ঘটনা আরো অনেক অনেক বেশি আছে। কিন্তু দয়ার নবী (সা) এসব কোনো অত্যাচারকেই কখনো পাত্তা দেননি। এতটুকু ভেঙেও পড়েননি।

বরং বাধা যত বেশি এসেছে, ততোই তিনি কঠিন মনোবল আর হাজার গুণ সাহসে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। আর এভাবে আঁধারের কালো পর্দা ভেদ করে তিনি তুলে ধরেছেন সত্যের প্রদীপ্ত সূর্য।

বস্তুত রাসূল (সা)-এর জীবন, তাঁর সাহস, তাঁর চরিত্র, তাঁর দেখানো পথই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পথ। আমাদের জন্য একমাত্র পাথেয়।◎

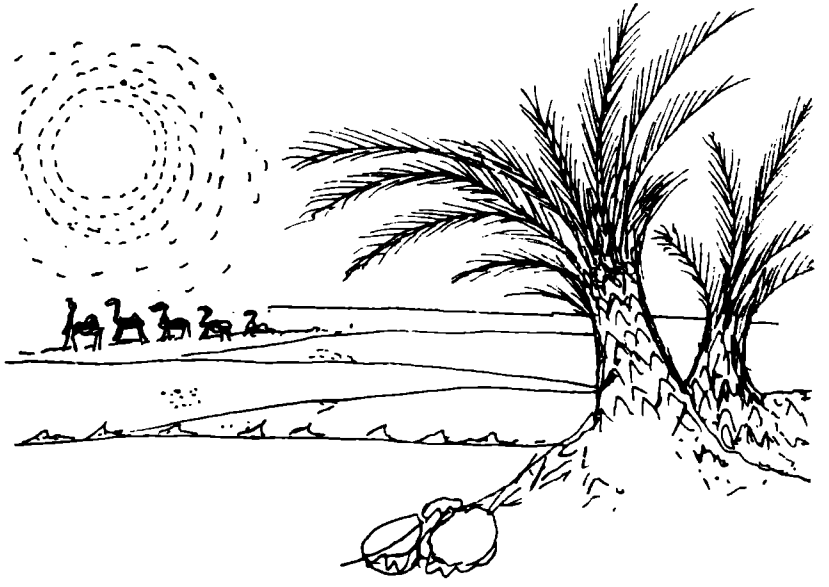

# বিস্ময়কর বিজয়

কুরাইশদের একটি বিশাল বাণিজ্যিক কাফেলা।

এগিয়ে চলেছে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে।

সংখ্যায় ত্রিশ–চল্লিশ জন।

নেতৃত্বে আছে এক অসাধারণ বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি আবু সুফিয়ান! আসছে সিরিয়ার দিক থেকে।

আবু সুফিয়ান বাণিজ্যিক বহর নিয়ে ফিরছে বহুদিন পরে।

ফিরছে মক্কায়। তার সাথে আছে অঢেল সম্পদ।

কুরাইশরা অপেক্ষায় দিন গুণছে।

আবু সুফিয়ান এতো দেরি করছে কেন? তার দায়িত্বে রয়েছে তাদের ব্যবসার হিসসা। ধন-সম্পদ।

একজন অবিশ্বাসী আর একজন অবিশ্বাসীকে কখনো বিশ্বাস করতে পারেনা। এটা তাদের ভাগ্যের এক চরম লাঞ্ছনা।

কুরাইশদের কেউ কেউ সন্দেহ করলো। তবে কি আবু সুফিয়ান তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার পাঁয়তারা করছে?

অসম্ভব!

কুরাইশদের চোখে-মুখে দুলে উঠলো একখণ্ড সন্দেহের মেঘ।

রাসূল (সা) বসে আছেন। সাহাবা বেষ্টিত।

সবাই তাকিয়ে আছেন দয়ার নবীর দিকে।

তাদের মধ্যে নীরবতার কুয়াশা।

জমাট হয়ে এসেছে হৃদয়ের উসখুস।

সহসা বিজলীর মতো ছড়িয়ে পড়লো নবীজীর ঠোঁটের দ্যুতিময় হীরক।

সাহাবীরা নড়েচড়ে বসলেন। আরও বেশি মগ্ন হলেন তারা। বুঝলেন নবী (সা) কিছু বলবেন।

মুখ খুললেন আলোকের সভাপতি। বললেন, 'আবু সুফিয়ান অঢেল ধন-সম্পদ নিয়ে এখন মরুভূমির মধ্যে। যাও! আল্লাহ হয়তোবা ঐ সম্পদ তোমাদের হস্তগত করে দেবেন।'

কথা শেষ করলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

সাহাবীরা তাকালেন একে অপরের দিকে।

সকলের চোখে-মুখে নির্দেশ পালনের সম্মতির স্মারক। তারা দেরি না করে স্পর্শ করলেন সিদ্ধান্তের পর্বত।

প্রস্তুতির পালা শেষ।

হেজাজের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো আবু সুফিয়ান।

তার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো সন্দেহের আগুন। কাফেলাকে বোধহয় ধাওয়া করছে কোনো শক্তিশালী বাহিনী। চারদিকেই সতর্ক দৃষ্টি। যাকে সামনে পায় তার কাছেই জিজ্ঞেস করে। জানতে চায়, তারা কোনো আক্রমণকারীর খবর জানে কি না।

কেউ পাশ কেটে যায়।

আবার কেউবা বলে ফেলে আবু সুফিয়ানের মুখের ওপর। 'হ্যাঁ, আসছেন মুহাম্মাদের সাথীরা আসছেন। সুতরাং সাবধান!'.....

মুহাম্মাদের বাহিনী!

অকস্মাৎ অনড় হয়ে গেল আবু সুফিয়ানের পা।

দুশ্চিন্তার ঘামে ভিজে গেল তার শরীর। উদ্বিগ্ন আর ভয়ে থরথর কম্পমান।

সত্যিই কি তারা আসছে?

আবু সুফিয়ানের মাথায় সহসা আছড়ে পড়লো একখণ্ড আতঙ্কের পাথর।

ভেবে নিলো কিছুক্ষণ। তারপর দামদামকে পাঠিয়ে দিল মক্কায়।

'যাও! দ্রুত খবর দাও কুরাইশদের। সাহায্যের ভীষণ প্রয়োজন। আমরা এখন বিপদের মুখোমুখি। বজ্রপাতের মতো যে কোনো সময়ে নামতে পারে আমাদের ওপর গজবের বৃষ্টি। মুহাম্মাদের সাথীরা আসছে। ক্রুদ্ধ ঝড়ের বেগে।'

দলপতির নির্দেশ!

দামদাম ছুটে চললো বিদ্যুৎগতিতে। মক্কার দিকে।

## দুই

গভীর রাত।

চারদিকে নীরব নিস্তব্ধ।

একটা গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে সমগ্র মক্কাকে। ঘুমে আচ্ছন্ন সকল জনপদ। উটগুলো বিশ্রামে জাবর কাটছে। অবিরাম।

হঠাৎ ঘুমের আবরণ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো আতিকা। ভয়ের মৌমাছিরা হুল ফুটাচ্ছে তার কোমল শরীরে। হুলগুলো ভীষণ কষ্টদায়ক। যন্ত্রণায় ছটফট করছে একাকী। অস্থির আতিকা।

ঘামে ভিজে গেছে তার সমগ্র শরীর। দু'হাতে মুখ মুছে আবার শুয়ে পড়লো। ভুলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। ভয়ংকর সেই স্বপ্নটি তার চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের অবাধ্য তরঙ্গের মতো। বারবার।

নির্ঘুম চোখে ভোরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকলো আতিকা।

প্রভাতের পাখিরা এক সময় ডেকে উঠলো কুরাইশদের ঘরের চালে। প্রতীক্ষার প্রহর শেষ।

আড়মোড়া ভেঙ্গে রাতের দুঃস্বপ্নের ক্লান্তির ভার ঝেড়ে ফেলতে চাইলো আতিকা। কিন্তু ব্যর্থ হলো।

বোনের উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠলো আব্বাসের বুক। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছে আতিকা? রাতে ঘুমাওনি বুঝি? এতো মলিন দেখাচ্ছে কেন তোমার চেহারা?'

স্বপ্নের কথাটি ঠেলে উঠলো আতিকার গলার উপকণ্ঠে। কোনোক্রমেই আর চেপে রাখতে পারলো না সে। বললো, 'ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি ভাই! গতরাতে। বুকটা এখনো ধড়ফড় করছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনে।'

আব্বাসের কণ্ঠে বিস্ময়, 'বলো বোন, কি দুঃস্বপ্ন দেখেছো, আমাকে খুলে বলো। ভারমুক্ত হও। ছুঁড়ে ফেলো বুক থেকে শংকা আর কষ্টের পাথর। জলদি বলো আতিকা!'

কেঁপে উঠলো আতিকার ঠোঁট। বললো, 'কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম, একজন সওয়ার মক্কার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে নেমে এলো। তারপর চিৎকার করে বললো– 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। মাত্র তিন দিন।'

একটু থামলো আতিকা।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলো, 'তারপর দেখলাম, বহু লোক তার পাশে সমবেত হলো। তারা প্রবেশ করলো মসজিদুল হারামে। বীরদর্পে। সবাই যখন তার পাশে জমা হলো তখন দেখলাম, তার উটটি তাকে নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করছে। কাবার ভেতর থেকে লোকটি চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে তোমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। তারপর তারপর, দেখলাম, তার উটটি তাকে নিয়ে আরোহণ করলো আবু কুবাইশ পর্বত শিখরে। সেই পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে সে আবার চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে তোমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। মাত্র তিন দিন।'

কথা অসমাপ্ত রেখে কয়েকবার দম ছেড়ে নিল আতিকা।

তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। চাবুকের আঘাতের মতো স্পষ্ট। মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'তারপর দেখলাম, সেই পর্বতের শিখর থেকে একটি পাথরের চাঙ ফেলে দিল লোকটি। গড়াতে গড়াতে সেটি পর্বতের পাদদেশে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছিটকে পড়া কাঁচের মতো। এবং কি আশ্চর্য! সেই ভয়ংকর পাথরের টুকরোর অংশ মক্কার কুরইশদের প্রতিটি গৃহে অকস্মাৎ প্রবেশ করলো।

'সর্বনাশ!'.

আব্বাসের কণ্ঠ দিয়ে সহসা বেরিয়ে এলো ভয়তাড়িত একটি দীর্ঘশ্বাস। বললো, 'আমি নিশ্চিত। কুরাইশদের ওপর নেমে আসছে একটি ভয়ংকর ধ্বংসের প্লাবন। এই স্বপ্নের কথা তুমি আর কাউকে বলো না, আতিকা।'

'না বলবো না ভাই। তুমিও বলো না কাউকে।'

দু'জনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কিন্তু সময় বড়ো বেরহম।

সময়ের বাতাস বহন করে নিয়ে গেল এই গোপন স্বপ্নটি। মুহূর্তে পৌঁছে গেল কুরাইশদের ঘরে ঘরে। পৌঁছে গেল আবু জেহেলের কাছেও।

ধূর্ত শিয়ালের চেয়েও সতর্ক আবু জেহেল। শকুনের মতো তার ঘ্রাণ শক্তি। আর হিংস্রতায় সে হার মানায় বনের বাঘকেও। সেই আবু জেহেল। স্বপ্নের কথাটি শুনার পর ডেকে পাঠালো আব্বাসকে। জিজ্ঞেস করলো স্বপ্নের কথা। কণ্ঠে তার ভর্ৎসনা আর তিরস্কার।

আব্বাস একটু চিন্তা করলো।

তারপর বললো, 'হ্যাঁ। আতিকা—আমার বোন এমনই একটি স্বপ্ন দেখেছে।'

হায়েনার মতো হেসে উঠলো আবু জেহেল।

বললো, 'ঠিক আছে। আমরা তিন দিন অপেক্ষা করবো। যদি আতিকার স্বপ্ন সত্যি হয় তাহলে তো অন্যকথা। আর যদি সত্যি, না হয় তাহলে লিখিতভাবে ঘোষণা দেয়া হবে যে, কুরাইশদের মধ্যে তোমাদের মতো আর কোনো মিথ্যাবাদী পরিবার নেই।'

আবু সুফিয়ানের প্রেরিত দামদাম দুঃসংবাদ নিয়ে তখনও মক্কায় পৌঁছায়নি।

দামদাম মক্কায় পৌঁছুবার তিন দিন আগেই স্বপ্নটি দেখছে আতিকা।

আবু জেহেলের তিরস্কারের বিষে জর্জরিত আব্বাস (রা)।

চিন্তামগ্ন সে। মরুভূমির লু-হাওয়া বয়ে যচ্ছে তার মগজে ভেতর।

কিন্তু আবু জেহেলকে উচিত জবাব দিতে পারলো না সে। হারিয়ে গেল তার প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিশোধের একটি আলপিন মাথা উঁচু করে তবুও তার অস্তিত্ব প্রকাশ করলো আব্বাসের চোখের ভেতর।

## তিন

তিন দিন পর।

বিষণ্ন এবং উদ্বীগ্ন আবু জেহেল।

অস্থিরতার হু হু বাতাসে কেবলই পাক খাচ্ছে।

দ্রুত, খুব দ্রুত মসজিদের দরোজার দিকে ছুটে এলো।

তার চোখে-মুখে শংকার ঢল।

দামদামের চিৎকার ধ্বনিটা যেন তার কানের পর্দা ছিঁড়ে ঢুকে পড়েছে সম্ভাব্য মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে। দামদামের চিৎকারটি যেন তখনো তার বুকে পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। মক্কার মরুভূমিতে উটের পিঠে বসেই দামদাম চিৎকার করে বলে যাচ্ছে,

'হে কুরাইশগণ! মহাবিপদ! তোমাদের ধন-সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে। মুহাম্মাদের বাহিনী তার দলের পিছে ধাওয়া করেছে। তাকে সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে যাও।'

শেষ পর্যন্ত আতিকার স্বপ্নই সত্য হলো?

ভাবছে আবু জেহেল।

কিছুক্ষণ! তারপর সে ডাক দিল কুরাইশদের। প্রস্তুত হতে বললো তাদের। দ্রুত। খুব দ্রুত।

কুরাইশরা প্রস্তুত।

মুহাম্মাদের বাহিনীকে রুখবার জন্যে এক হাজার কুরাইশের এক বিশাল বাহিনী সমরসাজে সজ্জিত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান তাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে।

কুরাইশরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একত্রিত হলো।

দল নেতা আবু জেহেল। উপস্থিত কেউ কেউ শংকিত।

যদি মুহাম্মাদের বাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করে? তাহলে তো পরাজয় এবং মৃত্যু অনিবার্য!

এক অজানা আশংকায় তারা কেউ কেউ দ্বিধান্বিত। তাদের বুকে এসে জমা হলো দোদুল্যমানতার কুয়াশার পর্বত।

যুদ্ধে যাবে কি যাবে না ভাবছে একাংশ।

ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে সহসা নড়ে উঠলো ইবলিস।

মানুষের বেশে উপস্থিত হলো সে দ্বিধান্বিত কুরাইশদের মাঝে। তার কণ্ঠে মিথ্যা অভয়। বললো, 'কোনো ভয় নেই। তারা যেন পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে সেটা আমি খেয়াল রাখবো। তোমরা এগিয়ে যাও!'

দ্বিধান্বিত মানুষগুলো এবার বুকটান করে উঠে দাঁড়ালো। ইবলিসের কুপরামর্শে তারা স্বস্তি ফিরে পেল। আবু জেহেলের বুক থেকেও নেমে গেল দুশ্চিন্তার ভারী পাথর।

কুরাইশদের একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা ত্যাগ করলো ইবলিসের জানের দোস্ত—আবু জেহেল।

## চার

রমজান মাস।

রাসূল (সা) প্রস্তুত করলেন তাঁর তিনশো চৌদ্দজনের একটি বাহিনী। উটের সংখ্যা মাত্র সত্তর। সংখ্যায় আবু জেহেলের বাহিনীর চেয়ে নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কি হবে?

রাসূল (সা)-এর একেক জন সাহাবী তো একেকটি ওহুদ পর্বত।

বুকে তাদের সাহসের সমুদ্র।

এই দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন রাসূল (সা)। মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে তুলে দিলেন একটি শাদা পতাকা। আর রাসূল (সা)-এর সামনে রাখলেন আরও দু'টি কালো পতাকা। যার ভেতর একটি পতাকার নাম 'ঈগল'।

রাসূল (সা) চলছেন তাঁর বাহিনী নিয়ে।

মক্কার পথ ধরে।

মদীনার বাইরের গিরি প্রবেশ পথে পৌঁছুলেন তিনি। যাত্রা বিরতি করলেন রাওহার সাজসাজ কূপের কাছে। একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর আবার যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য বদর প্রান্তর।

কিছুই গোপন থাকলো না শেষ পর্যন্ত।

রাসূল (সা) জেনে গেলেন কুরাইশদের অভিযানের কথা। আবু জেহেলের নেতৃত্বে তারা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে রক্ষার জন্যে। এগিয়ে আসছে তারা যুদ্ধ করার জন্যে।

খবরটি জানিয়ে দিলেন রাসূল (সা) সাথীদেরকে। বললেন, 'কিভাবে মুকাবিলা করা যায়– পরামর্শ দাও।'

খুশি হলেন সকল সাহাবী।

রাসূল (সা) পরামর্শ চাচ্ছেন! তারা বললেন প্রাণ খুলে নিজের কথা। নিঃসংকোচ অভিমত।

মন দিয়ে শুনলেন রাসূল (সা)।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা বেরিয়ে পড়ো। আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান অথবা কুরাইশদের বাহিনী—এ দু'টোর যে কোনো একটি আমাদের হাতে পরাভূত হবে। আল্লাহর কসম, আমি যেন এখনই দেখতে পাচ্ছি কুরাইশদের শোচনীয় মৃত্যু।'

উৎসাহিত হলেন প্রতিটি সত্যের সৈনিক। সাহসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর একবার লাফিয়ে উঠলো তাদের অকম্পিত পাঁজর ফুঁড়ে।

সাথীদের নিয়ে রাসূল (সা) পৌঁছে গেলেন বদরের কাছাকাছি। তাঁবু গাড়লেন তাঁরা রাসূল (সা)-এর নির্দেশে।

## পাঁচ

শংকিত আবু সুফিয়ান।

চারদিকেই সতর্ক দৃষ্টি। তার কাফেলাকে পেছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। জলাশয়ের কাছে দেখতে পেল মুজদি ইবনে আমেরকে। তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এদিকে তেমন কাউকে দেখেছো কি?'

জবাব দিল মুজদি। বললো, 'সন্দেহজনক তেমন কাউকে দেখিনি। তবে দু'জন উট সওয়ার-কে দেখলাম। তারা এই পাহাড়টির কাছে উট থেকে নামলো। তারপর মশকে পানি ভরে আবার চলে গেল ঐ পথে।'

মুহূর্তে কেঁপে উঠলো আবু সুফিয়ানের দুরুদুরু বুকটা। ভাবলো, আক্রমণকারীদের কেউ নয়তো?

সর্তক পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে জলাশয়ের কাছে।

বিক্ষিপ্তভাবে সেখানে ছড়িয়ে আছে আগন্তুকের উটের গোবর। একমুঠো গোবর হাতে তুলে নিল আবু সুফিয়ান। পরীক্ষা করে দেখলো গভীরভাবে। গোবরের ভেতর দেখতে পেল সে কয়েকটি আঁটি। সাথে সাথে দুশ্চিন্তার পাথরটি সরে গেল তার বুক থেকে। বুঝলো, এই উট ইয়াসরিবের। কেননা, যে খাদ্যের গোবর এটা, তা কেবল ইয়াসরিবের পশুদেরই খাদ্য।

শংকামুক্ত হলো আবু সুফিয়ান। মুহাম্মাদ (সা)-এর (সা) বাহিনী তাকে নিশ্চয়ই আর আক্রমণ করতে আসছে না!

সে দ্রুতবেগে জলাশয় ত্যাগ করে ফিরে এলো তার কাফেলার কাছে। তারপর বদর প্রান্তর বামে রেখে সমুদ্র কিনার বেয়ে এগিয়ে চললো সুস্থির পদক্ষেপে। মক্কার দিকে।

কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিল আবু সুফিয়ান। জানালো, 'তোমরা তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, তোমাদের লোকজন আর তোমাদের সহায়-সম্পদ মুহাম্মাদের বহিনী থেকে রক্ষা করার জন্যে এসেছো। তার আর দরকার নেই। আল্লাহ এগুলোকে রক্ষা করেছেন। অতএব তোমরা ফিরে যাও মক্কায়। আপন গৃহে।'

যথা সময়ে আবু জেহেলের কাছে পৌঁছে গেল আবু সুফিয়ানের বার্তা।

পুলকিত আবু জেহেল।

তার চোখ থেকে যেন সরে গেল অশুভ মেঘের স্তূপ। বললো, 'তবুও আমরা বদরে যাবো। সেখানকার বিখ্যাত মেলায় উপস্থিত হয়ে আনন্দফূর্তি করবো। তিনদিন থাকবো সেখানে। পশু জবাই করবো। মদ খাবো। গায়িকারা বাজনা বাজিয়ে গান গাইবে। আমরা আরবদেরকে আমাদের অভিযানের কথা শুনাবো। শুনাবো বাহিনী গড়ে তোলার অমর কাহিনী। তাদের মনে ভীতির কাঁটা বিধিয়ে দেবো আমরা। অতএব হে সাথীরা, বদরের মেলায় চলো!'

আবু জেহেল তার বাহিনী নিয়ে বদরের একটি দূরবর্তী মরুময় টিলার পাশে তাঁবু ফেললো।

তারা তখন আনন্দে বিভোর।

হৃদয় উপচে পড়ছে খুশির ঢল।

এ সময়ে আল্লাহ বৃষ্টি দিলেন। প্রচুর বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তাঁবুর আশ-পাশ ভিজে একাকার। তবু রাসূল (সা)-এর চলাফেরা করতে মোটেই অসুবিধা হলো না। বরং তাঁদের হৃদয়ে স্পর্শ করলো এক অপার্থিব স্বস্তির পরশ।

আবু জেহেলরা পড়ে গেল মহাসমস্যায়। বৃষ্টির কারণে তাদের চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়লো।

যেখানে বেশি পানি জমা হয়েছে, রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীকে সেখানে নিয়ে গেলেন। হুবাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল (সা)! এই জায়গাটা কি আল্লাহর নির্দেশেই আপনি বেছে নিয়েছেন?'

'না। এটা আমার একটি রণকৌশল মাত্র।' স্মিত হেসে জবাব দিলেন দয়ার নবী (সা)।

হুবাব (রা) বললেন, 'তাহলে আমার পরামর্শ এখানকার চেয়ে একটু কম পানি যেখানে চলুন আমরা সেখানেই তাঁবু গাড়ি।'

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন'?

জবাবে হুবাব (রা) বললেন, 'আমরা তেমন একটি জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলবো। সেখানে চৌবাচ্চায় প্রচুর পানি ভরে রাখবো। প্রচুর পানি পাবো আমরা। কিন্তু তারা পাবে না। পানির সমস্যায় কাতর হয়ে পড়বে আবু জেহেলের দল।'

রাসূল (সা) খুশি হলেন।

হুবাব (রা)-এর অভিমতটি চমৎকার!

তার পরামর্শে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরের তেমনি একটি জায়গায় তাঁবু ফেললেন। তৈরি করা হলো একটি চৌবাচ্চা। পানি ওঠানোর জন্য তাতে একটি পাত্রও রাখা হলো। রাসূল (সা)-এর জন্যে তৈরি করা হলো একটি সুরক্ষিত মঞ্চ।

সেই মঞ্চে অবস্থান করতে থাকলেন সেনাপতি নবী মুহাম্মাদ (সা)।

## ছয়

সকালের সূর্য মরুভূমিকে ঘিরে রেখেছে প্রহরীর মতো।

চিকচিক করছে বদরের বালুকণা। পাথরের টুকরোরাও হেসে উঠেছে সূর্যের বিভায়।

আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠলো আবু জেহেলের বাহিনী। বেরিয়ে এলো তারা তাদের তাঁবু থেকে।

কাফেরদের নামতে দেখে রাসূল (সা) ফিরে দাঁড়ালেন আল্লাহর দিকে। বললেন, 'হে রাব্বুল আলামীন! এই সেই কুরাইশরা। যারা গর্ব আর আহংকারের জন্যে আপনার সাথে বিদ্রোহ ও আপনার রাসূল (রা)-কে অস্বীকার করে আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন তার সময় উপস্থিত। হে আল্লাহ! ওদেরকে আজ সকালেই ধ্বংস করে দিন।'

আবু জেহেলের বাহিনীর মধ্যে দেখা দিল আবার দ্বিধার কুয়াশা। কেউ বললো, 'যুদ্ধ করার দরকার নেই। মুসলিম বাহিনী ক্ষুদ্র হলেও তারা আজ মরণপণ করে নামবে যুদ্ধের ময়দানে। তাদের একজনকে মারলে তারা আমাদের একজনকে না মেরে ছাড়বে না। ক্ষতিটা আমাদেরই বেশি হবে। সুতরাং এখনো ভেবে দেখার সময় আছে।'

হুংকার দিয়ে উঠলো দস্যু আবু জেহেল! 'না, যুদ্ধই একমাত্র ফায়সালা।'

মুহূর্তেই বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

সরব হয়ে উঠলো তাদের সকল যোদ্ধা।

মুসলিম বাহিনীও প্রস্তুত।

আসওয়াদ ছিল কুরাইশদের মধ্যে গণ্ডারের মতো চরম এক দৈত্য। বুক ফুলিয়ে বললো সে, 'মুসলমানদের চৌবাচ্চা থেকে আমি পানি পান করবো। কিংবা তা ভেঙ্গে ফেলবো।'

প্রতিজ্ঞায় অটল আসওয়াদ।

এগিয়ে গেল সে বীরদর্পে মুসলমানদের চৌবাচ্চার দিকে।

হামযা ছিলেন প্রস্তুত। তীরের আঘাতে ধরাশায়ী করলেন তিনি শক্তিশালী আসওয়াদকে। বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন আসওয়াদের একটি পা।

তারপরও সে বুক টেনে টেনে এগিয়ে যেতে চাইলো চৌবাচ্চার দিকে। কিন্তু সে সুযোগ আর দিলেন না দুঃসাহসী হামযা (রা)। এবার তিনি চৌবাচ্চার সীমানার ভেতরেই হত্যা করলেন আসওয়াদকে।

এরপরই ভয়ংকর আকার ধারণ করলো বদর প্রান্তর।

যুদ্ধ চলছে তুমুল বেগে।

হযরত হামযা, আলী, বিলাল, হারেসসহ সকল সাহাবী সাহসের সাথে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে গেলেন।

তাদের চোখ দিয়ে তখন প্রবাহিত হচ্ছে কেবল বারুদ।

ক্ষীপ্রগতিতে চলছে হাতের তরবারি।

যুদ্ধ পরিচালনা করছেন স্বয়ং রাসূল (সা)। তিনি নির্দেশ দিলেন,

'শত্রুরা তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হটিয়ে দেবে সীমানার বইরে। মৃত্যুর দিকে।'

রাসূল অবস্থান করছেন তাঁর মঞ্চে।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ।

তারপর বিনীতভাবে মহান আল্লাহর সমীপে বললেন, 'হে মহান রাব্বুল আলামীন! এই মুষ্টিমেয় মুসলমান যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আপনার ইবাদাত করার জন্যে আর কেউ থাকবে না।'

রাসূল (সা)-এর প্রার্থনায় কেঁপে উঠলো আল্লাহর আরশ।

মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে তার হাঁক মুহূর্তেই পৌঁছে গেল আল্লাহর দরবারে।

রাসূল (সা) এবার চোখ খুললেন।

প্রশান্ত আর প্রত্যয়দীপ্ত তাঁর চেহারা। আবু বকরকে (রা) ডেকে বললেন, 'সুসংবাদ আছে! আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ঐ দেখ জিবরাইল একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে হাওয়ার গতিতে ছুটে আসছেন। তার পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে জমে গেছে ধুলোর আস্তরণ।'

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলেন রাসূল (সা)।

তাঁর সাথীদেরকে শুনালেন তিনি অভয়বাণী। বললেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আজ যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করবে এবং শুধু সামনের দিকে এগুতে থাকবে, কোনো অবস্থায় পিছু হটবে না— আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।'

কয়েকটি খুরমা হাতে নিয়ে চিবুচ্ছিলেন উমাইর ইবনু হুমাম।

তাঁর কানে গেল রাসূল (সা)-এর এই ঘোষণা। সাথে সাথে তিনি ফেলে দিলেন হাতের খুরমা এবং মুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালেন সাহসের অজেয় পর্বতের ওপর ভর করে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর।

তারপর!

তারপর প্রাণপণে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। শীতল করলেন তার তৃষিত বুক।

রাসূল (সা) দেখছেন যুদ্ধ ক্ষেত্র।

দেখছেন অগ্নিময় বদর প্রান্তর। তারপর একমুঠো ধুলো নিয়ে এগিয়ে গেলেন কুরাইশ বাহিনীর দিকে। 'ওদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক'– বলে রাসূল (সা) ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন ধুলোর কুণ্ডলী। তারপর তাঁর বাহিনীকে বললেন রাসূল, 'জোর হামলা চালাও!'

অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজয় ঘটলো কুরাইশদের।

চরমভাবে পরাভূত হলো তারা।

তাদের অনেক বড়ো বড়ো নেতা নিহত হলো মুসলমানদের হাতে। অনেকে হলো বন্দী।

এক সময় থেমে গেল যুদ্ধের ঘনঘটা।

বদর প্রান্তর নীরব নিথর। যুদ্ধ শেষে রাসূল বললেন, 'নিহতদের মধ্যে আবু জেহেলের লাশ আছে কিনা খুঁজে দেখো ভালো করে।'

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ শুনে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। বললেন, 'হে রাসূল (সা)! আবু জেহেলকে হত্যা করা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি।'

'সত্যিই?' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন।

আবু জেহেলের মস্তকটি রেখে দিলেন মাসউদ রাসূল (সা)-এর সামনে। বললেন, 'জি, সত্যি। এই দেখুন আবু জেহেলের খণ্ডিত মস্তক।'

ধীরে ধীরে একফালি হাসির রেখা দুলে উঠলো নবীজীর স্বর্ণালী ঠোঁটে। সেই কুসুমিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সাহাবীদের সুদীপ্ত চেহারা।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রক্তাক্ত বদর প্রান্তর।

বদরের বিজয়— মূলতঃ সত্যের বিজয়।

বদরের বিজয় সে এক মহাবিস্ময়কর বিজয়!◎

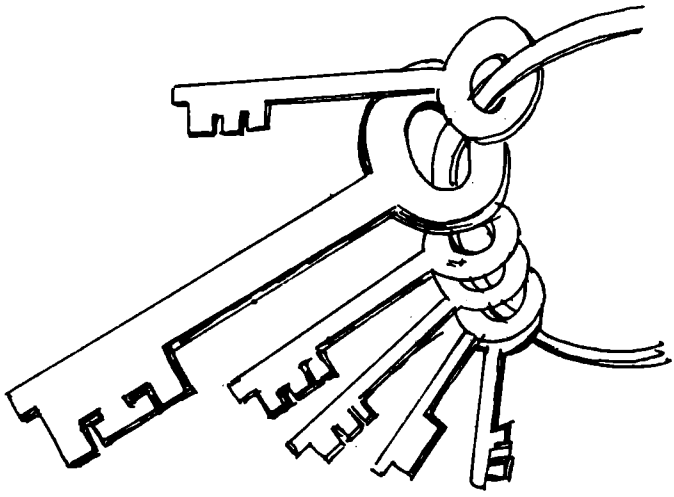

# সৌভাগ্যের চাবি

প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হচ্ছে।

অধীর প্রতীক্ষায় আছে মদীনার আনসাররা।

কখন আসবেন সত্যের বার্তাবাহক, আলোর দিশারী নবী মুহাম্মাদ? কখন?

প্রতিদিন, ভোর হতেই মদীনা থেকে চর-পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে আনসাররা চাতকের মত চেয়ে থাকেন পথের দিকে।

সময় কেটে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত।

এভাবে কেটে যায় দিনের পরদিন।

কিন্তু আসেন না দয়ার নবী মুহাম্মাদ। আর কত চেয়ে থাকা?

এক সময় শেষ হলো প্রতীক্ষার পালা। তারা খবর পেলেন এক ইহুদীর কাছে– আসছেন নবী মুহাম্মাদ।

আসছেন প্রদীপ্ত সূর্য।

মেঘের আস্তরণ ভেদ করে, আঁধার কেটে কেটে আসছেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

নবী আসছেন!

ভোরের নতুন উদিত সূর্যের মত খুশিতে ডগমগ করছেন আনসাররা। বিদ্যুৎগতিতে তারা ছুটে গেলেন সেই দিকে, নবীকে স্বাগত জানাতে।

মদীনার উপকণ্ঠ।

কুবা পল্লী।

মনোমুগ্ধকর এক চমৎকার জায়গা।

নবী মুহাম্মাদ (সা) এই কুবা পল্লীতে অবস্থান করলেন, কয়েকদিন। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন, দ্রুত যেতে চান মদীনার মূল শহরে।

সেই এক অবাক করা দৃশ্য!

পথের দুই ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মদীনার পিপাসার্ত জনগণ। বালক, কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধের দল।

দাঁড়িয়ে আছে বনু নাজ্জারসহ অসংখ্য আনসার গোত্রের লোক। দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের দরোজায় সম্মানিত গোত্রপতিরা।

পর্দার আড়ালে আছেন মা-বোনেরা।

বাতাসে বাতাসে ভেসে যাচ্ছে মিষ্টি মধুর সুর—

তালায়াল বাদরু আলাইনামা দায়া লিল্লাহে দায়ী।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত অবিস্মরণীয় অভ্যর্থনা।

কেবল নবীর জন্য।

সে কেবল শান্তির বার্তাবাহক নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্য।

এমনি এক আনন্দঘন অপূর্ব অভ্যর্থনার মাধ্যমে মদীনার মূল শহরে প্রবেশ করলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূল (সা)-এর মদীনায় আগমনের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যিনি তাঁর সাথে ছায়াসঙ্গী ছিলেন, তিনি– অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন– আবু আইউব আল-আনসারী।

আবু আইউব।

মহাভাগ্যবান এক সাহাবী।

তিনি ভাগ্যবান– কারণ, মদীনায় পৌঁছে দয়ার নবী কার আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন, সেটি ছিল একটি মহাজিজ্ঞাসার ব্যাপার।

মদীনার সবাই প্রতীক্ষায় ছিলেন, সবাই চাচ্ছিলেন রাসূল (সা)-এর বাহন উটনীকে তার বাড়ির দিকে নেবার জন্য। চেষ্টাও করছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, 'তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও, সে [আল্লাহর তরফ থেকে] নির্দেশপ্রাপ্ত।'

উটনী চলছে।

চলতে চলতে এক সময় বনী মালিক ইবনে নাজ্জারের মধ্যের এক স্থানে বসে পড়লো।

খুব কাছেই ছিল আবু আইউবের বাড়ি। তিনি আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনুমতি দিলে আমি বাহনের পিঠ থেকে মালপত্র নামাতে পারি।'

আবু আইউব রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তার আরজি জানালেন। চারপাশেই মানুষের ভিড়।

তারা সবাই চান– রাসূল আমার বাড়িতেই উঠুন।

অগত্যা লটারীর আশ্রয় নিতে হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য!

সেখানেও সর্ব প্রথম যে নামটি উঠলো– তার নাম আবু আইউব।

শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর মেহমানদারির গৌরব অর্জন করলেন হযরত আবু আইউব (রা)।

একদিন দু'দিন নয়, প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত আবু আইউব (রা) দয়ার নবী (সা)-কে তার নিজের বাড়িতে খেদমত করার সুযোগ পেলেন।

এমন বিরল সৌভাগ্য পৃথিবীর আর কেউ অর্জন করতে পারেন নি।

হযরত আবু আইউব (রা)।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন দয়ালু, সৎ এবং অসীম সাহসী, তেমনি ছিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলপ্রেমে মশগুল।

নিজের জীবনের চেয়েও তিনি অনেক বেশি ভালবাসতেন আল্লাহর রাসূল (রা)-কে।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রতিটি যুদ্ধে আবু আইউব রাসূল (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করেন।

রাসূল (সা)-এর ওফাতের পরও, যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তার জীবিত কালে, তিনি প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

'ইনফিরু খিফাফান ওয়াসিকালান' অর্থাৎ তোমরা হালকা এবং ভারী অবস্থায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়।

আবু আইউব (রা) পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশকে গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে। তিনি বলতেন—

'আমি নিজেকে সব সময় 'খাফীফ' ও 'সাকিল'ই পেয়েছি।'

ইসলামী সেনাদলের একজন সৈনিক হিসেবে বেঁচে থাকা, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখা-জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে তিনি মনে করতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে, আশি বছর বয়সেও আবু আইউব মিসরের পথে রোম সাগর পাড়ি দিয়ে ইস্তাম্বুলে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার জন্য গমন করেন।

হযরত আবু আইউবের চরিত্রের তিনটি মৌলিক গুণ ছিল– রাসূল (সা)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা, ঈমানী তেজ ও উদ্দীপনা এবং সত্যভাষণ।

কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময়ের কথা।

একদল মুসলিম সৈনিক তাদের জাহাজে আবু আইউবকে খাবারের দাওয়াত দিলেন। তিনি যথাসময়ে সেখানে হাজির হয়ে বললেন, 'তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছ, অথচ আজ আমি রোজা রেখেছি। তবুও তোমাদের দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি– একজন মুসলমানের উপর তার অন্য এক মুসলিম ভাইয়ের ছয়টি অধিকার আছে। তার কোনটি ছেড়ে দিলে একটি অধিকার ছেড়ে দেয়া হবে।

সেই ছয়টি অধিকার হলো– ১. দেখা হলে তাকে সালাম দিতে হবে, ২. দাওয়াত দিলে সাড়া দিতে হবে, ৩. হাঁচি দিয়ে– 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে 'ইয়ার হামুকল্লাহ' বলে জবাব দিতে হবে, ৪, অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে, ৫. মারা গেলে তার জানাজায় শরীক হতে হবে এবং ৬. কোনো ব্যাপারে উপদেশ চাইলে উপদেশ দিতে হবে।

আবু আইউব ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ।

ঈমানের ব্যাপারে ছিলেন সুদৃঢ় পর্বতের মত। আর কাফিরদের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।

আবু আইউব রাসূল (সা)-কে সম্মানের সাথে তার বাড়িতে রেখেছিলেন, তাঁকে প্রাণ দিয়ে আদর যত্ন এবং সেবা করেছিলেন এইজন্য তিনি এবং তার পরিবারটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল।

হযরত আলী তখন খলিফার দায়িত্বে। ইবনে আব্বাস বসরার গভর্নর।

একদিন আবু আইউব গেলেন সেখানে, ইবনে আব্বাসের কাছে। তাকে দেখেই ইবনে আববাস ভীষণ খুশি হলেন। বললেন, 'আমার ইচ্ছা, যেভাবে

আপনি রাসূল (সা)-এর জন্য আপনার ঘর খালি করে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে আজ আমিও আপনার জন্য আমার ঘর খালি করে দেই।'

এ কথা বলেই তিন পরিবারের সকলকে অন্যত্র সরিয়ে আবু আইউব (রা)-এর জন্য সকল সাজ সরঞ্জামসহ বাড়িটি খালি করে দিলেন।

হযরত আবু আইউব (রা)-এর জীবন কেটেছে যুদ্ধ ও জেহাদের ময়দানে। কাঁধ থেকে তরবারি নামিয়ে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ তিনি কখনো পাননি।

কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের ময়দান।

অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছেন মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল (সা)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু আইউব (রা)।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি কিছু চাওয়ার আছে? আমি আপনার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবো।'

আবু আইউব (রা), যিনি জান্নাতের বিনিময়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, দান করে দিয়েছেন তার সব কিছু, তিনি অন্তিম শয্যায় ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার জবাবে বললেন, 'আমি মারা গেলে আমার মৃত দেহটি ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে শত্রুভূমির অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে এবং শেষপ্রান্তে দাফন করবে। মুসলিম বাহিনীকে এই পথে দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে যাতে তাদের অশ্বের পদাঘাত আমার কবরের ওপর পড়ে এবং আমি বুঝতে পারি, তারা যে সাহায্য ও কামিয়াবী চায় তা তারা লাভ করতে পেরেছে।'

কি অসাধারণ ছিল আবু আইউব (রা)-এর অন্তিম বাসনা! কি গভীর প্রেম আর ভালবাসা ছিল তার ইসলামের জন্য।

এত কিছুর মধ্যেও আবু আইউব (রা) কিন্তু ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন– ঐ একটি মাত্র কারণে। মদীনায় রাসূল (সা)-কে নিজের বাড়িতে রেখে খেদমত করার দুর্লভ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। যে সৌভাগ্য ছিল অনন্য এবং অসাধারণ। যে সৌভাগ্যের চাবিটি দান করেছিলেন মহান রাব্বুল আলামীন কেবল তাঁকেই, হযরত আবু আইউব (রা)-কে। ◎

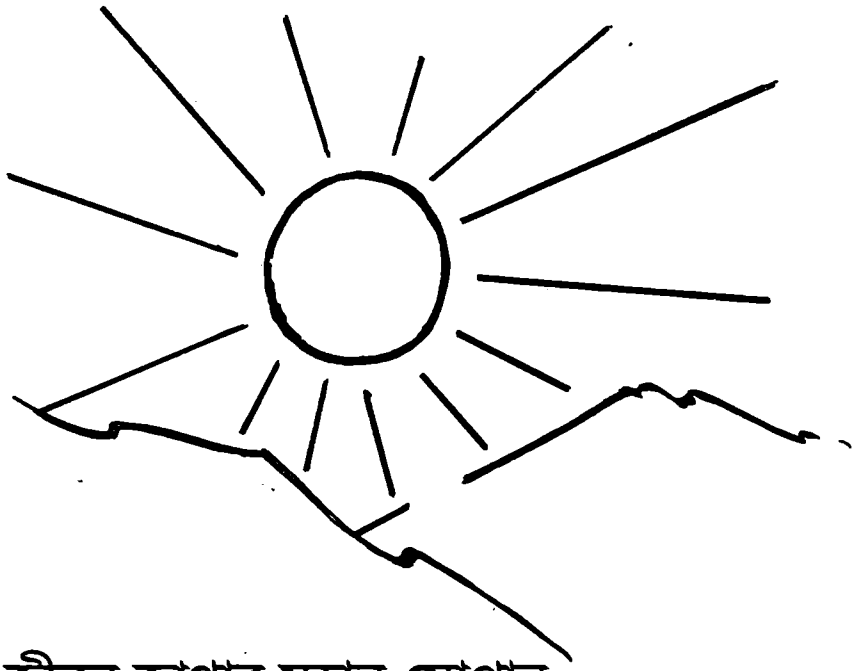

# জীবন জাগার মহান সোপান

আকাশের সীমানা জুড়ে কেবল আলো আর আলো।

সূর্যের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে দ্যুতিময় কিরণ।

কে দাঁড়িয়ে আছেন, কে?

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে শাদা শাদা, কার্পাশ তুলোর মত রূপোলি মেঘের খণ্ড। বাতাস– তার ডানা নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিম হিম শীতল হাওয়া।

কার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এমনি বেহেশতী পরশ ? কেন?

কারণ আর কিছু নয়।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন মহান রাব্বুল আলামীনের সবচেয়ে প্রিয় হাবীব– স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা)।

তিনি কথা বলেছেন।

কথা বলছেন একজন আরব বেদুঈনের সাথে।

নাম– সাওয়া ইবনে কায়স আল মুহাজিলী।

কিসের কথা ? কিসের আলাপন ?

বিষয়টি বেশ মজার।

রাসূল (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঘোড়া।

ঘোড়াটি যেমন নাদুস-নুদুস, তেমনি সুন্দর। ঘোড়াটি বিক্রি করতে চায় আবর বেদুঈন।

রাসূল (সা) দেখছেন। দেখছেন ঘোড়াটিকে। দেখছেন আর কেনার জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলই উসখুস করছেন।

দাম কত?

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন বেদুঈনের কাছে।

দামের কথা শুনে মুচকি হাসলো বেদুঈন। তারপর বললো তার ইচ্ছের কথা।

রাসূল (সা) রাজি হলেন। তাহলে এটাই ঠিক হলো। ঘোড়াটিকে আমি কিনলাম। বললেন রাসূল (সা)।

দরদাম ঠিক। কথা পাকাপাকি।

রাসূল (সা) ঘোড়ার দাম পরিশোধ করবেন বাড়িতে এসে। বেদুঈন তাতেও রাজি।

সেখানে আর কেউ ছিল না। ছিল না প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা কোনো সাক্ষী।

কথা যখন শেষ তখন আর দেরি কেন?

রাসূল (সা) চললেন বাড়ির দিকে। পেছনে সেই আরব বেদুঈন। তার হাতেই আছে ঘোড়ার লাগামটি।

তারা চলছেন। চলছেন সময়কে দু'ভাগ করে করে। সামনের দিকে। ক্রমাগত।

কিছুদূর আসার পর–

ঘোড়াটির দিকে নজর পড়লো আরো অনেকের।

তাই তো! এ যে দেখছি দারুণ ঘোড়া!

কেনার জন্যে এগিয়ে এলো কেউ কেউ।

একজন তো দাম হাঁকিয়ে বসলো অনেক বেশি।

অনেক মানে রাসূল (সা) যা দিচ্ছেন– তার চেয়েও বেশি।

সাথে সাথে চকচক করে উঠলো লোভের ছুরি। সেই ছুরিতে ফালা ফালা করে দিল বেদুঈনের জিহবা। মুহূর্তেই রাজি হয়ে গেল ঘোড়াটি বেশি দামে

বিক্রির জন্যে। বললো, 'হে রাসূল! ঘোড়াটি নিতে চাইলে নিতে পারেন। নইলে এর কাছে বিক্রি করে দেই।'

সে এমনভাবে কথাগুলো বললো, 'যেন রাসূল (সা)-এর কাছে তার ঘোড়াটি সে ইতিপূর্বে বিক্রিই করেনি।'

তাজ্জব ব্যাপার!

সে ভুলে গেল রাসূল (সা)-এর কথা।

ভুলে গেল তার প্রতিজ্ঞার কথা।

ভুলে গেল নয়– বরং বলা ভালো– অস্বীকার করলো।

আশ্চর্যের বিষয় বটে।

স্বয়ং রাসূল (সা)-এর সাথে মিথ্যাচার?

শুধু মিথ্যাচারই নয়। রীতিমত বাড়াবাড়ি!

রাসূল (সা) বললেন, 'ঘোড়াটি আমি কিনেছি। দাম পরিশোধের জন্যে এখন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

বেদুঈন। হতভাগ্য বেদুঈন তখনো অস্বীকার যাচ্ছে, "না! আমি আপনার কাছে ঘোড়া বিক্রি করিনি।'

'করোনি ?'

'না।'

'তুমি মিথ্যা বলছো।'

'যদি সত্যিই বিক্রি করে থাকি তাহলে আপনার সপক্ষের কোনো সাক্ষীকে হাজির করুন।'

**'সাক্ষী?'**

অবাক আর বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন দয়ার নবীজী।

**কে দেবে সাক্ষী?**

সেখানে তো কেউ ছিল না। কেউতো শোনেনি এই কেনা-বেচার কথা। চুক্তির কথা।

**বেশ অস্বস্তিকর পরিবেশ।**

**গুমোট হয়ে উঠলো চারপাশ।**

একি বলছে মিথ্যাবাদী বেদুঈন?

একজন দু'জন করে সেখানে উপস্থিত হলেন মুসলিম জনতা। অনেকেই। তাদের পূর্ণ দৃষ্টি রাসূল (সা)-এর দিকে। তাদের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঝরে পড়ছে বিশ্বাসের ধারা। হীরক খণ্ডের মত জ্বলছে তাদের প্রত্যয়ী চোখ।

সবাই সমস্বরে বললেন, 'না! ঘোড়াটি তুমি বিক্রি করেছো। বিক্রি করেছো প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে।'

'না, আমি বিক্রি করিনি।' বেদুঈনের সাফ জবাব।

ক্রুদ্ধ হলেন মুসলিম জনতা। অবশ্যই বিক্রি করেছো। রাসূল (সা) কক্ষণো মিথ্যা বলেন না। মিথ্যা বলার একটি দৃষ্টান্তও নেই তাঁর জীবনে। বরং তুমিই মিথ্যাবাদী। ধড়িবাজ!

তারপরও অস্বীকার করলো বেদুঈন, 'মোটেই না। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়– তাহলে হাজির করুন, হাজির করুন কোনো সাক্ষীকে। যদি কেউ সাক্ষী দিতে পারে যে, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে আমার ঘোড়াটিকে বিক্রি করেছি, তবে আমি তা মেনে নেব।'

সাক্ষী?

কে দেবে সাক্ষী?

সেখানে তো কেউ উপস্থিত ছিল না।

মহা ভাবনার বিষয়।

কিন্তু সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব বলে কথা!

স্বয়ং রাসূল (সা)-এর ব্যাপার নিয়ে কথা!

সমাধান তো হতেই হবে।

কিন্তু কীভাবে?

অবাক কাণ্ড!

হঠাৎ জনতার ফাঁক গলিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন একজন। তার চোখ থেকে ঝরছে কেবল বিশ্বাস আর দৃঢ়তার ফলগুধারা। বুকটান করে তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমি! এই আমিই তার সাক্ষী। আমি বলছি ঘোড়াটি তুমি বিক্রি করেছো রাসূল (সা)-এর কাছে। এবং রাসূল (সা) সেটি কিনেছেন তোমার কাছ থেকে। এবার বলো, বলো বিষয়টি সত্যি কিনা?'

সাক্ষীর কণ্ঠে এমনি দৃঢ়তা ছিল যে ভয়ে কেঁপে উঠলো বেদুঈনের দেহ।

হাজার হোক– সে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীরা তো সত্যের সামনে কেঁপে উঠবেই।

রাসূল (সা) তাকালেন সাক্ষীর দিকে। সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে।

তাঁর সেই দৃষ্টিতে ছিল অপার বিস্ময়।

'কীভাবে? কীভাবে তুমি এমন করে সাক্ষ্য দিলে খুজায়মা? তুমি তো আর সেখানে উপস্থিত ছিলে না!'

জিজ্ঞেস করলেন দয়ার নবীজী তাঁর প্রিয় সাহাবীর কাছে।

রাসূল (সা)-এর প্রশ্নে খুজায়মা শান্ত, স্থির। বললেন, 'হে দয়ার নবী (সা)! আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি ত সবই সত্য বলে জেনেছি। আর একথাও জেনেছি– আপনি সর্বদা সত্যই বলেন। কেবল সত্য ছাড়া আর কিছুই বলেন না। আপনি আসমানের যেসব খবর দেন– তার সবটুকুই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আর আপনি নিজে যা বলছেন– তা আমি বিশ্বাস করবো না? সেটা কেমন করে হয়? আমি জানি আপনি সত্যই বলেছেন।'

রাসূল (সা) শুনলেন। শুনলেন তাঁর এক প্রিয় সাহাবীর কথা। শুনলেন তার বিশ্বাস এবং আস্থার কথা। ভালোবাসার কথা। শুনলেন আর মুগ্ধ হলেন।

হ্যাঁ, এমনটিই তো দাবি করে ঈমান। যে ঈমানে থাকবে না এতটুকু কোনো খাঁদ। এতটুকু কোনো ফাঁক। এতটুকু কোনো সংশয়।

রাসূল (সা– খুশি হলেন। খুশি হলেন খুজায়মার জবাবে এবং ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে খুজায়মার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে বিবেচিত হবে।

সেদিন থেকেই খুজায়মা উপাধি পেলেন– 'জুআশ্ শাহাদাতাইন'- বা দুই সাক্ষ্যের অধিকারী।

কী বিস্ময়কর পুরস্কার!

রাসূল (সা) বলেছেন, 'খুজায়মা পুরস্কারের অধিকারী এক ভাগ্যবান সাহাবী। তিনি যেমন ছিলেন রাসূল (সা)-এর প্রিয়ভাজন, তেমনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি রাসূল (সা)-কে ভালোবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশি।

ইসলাম গ্রহণের পর, সেই প্রথম দিকে, তিনি একে একে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন তাঁর গোত্রের মূর্তিগুলো। সেটা ছিল অসীম এক সাহসের ব্যাপার। ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই।

কিন্তু দুঃসাহসী খুজায়মা, তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (রা)-কে ভালবেসে যে কোনো ঝুঁকি নিতেই প্রস্তুত ছিলেন সর্বক্ষণ। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তার সেই দুঃসাহসের সাক্ষর রয়ে গেছে।

রাসূল (সা)-ও কি কম ভালোবাসতেন তাঁর এই প্রিয় সাহবীকে? না, বরং অনেক–অনেক বেশি ভালবাসতেন।

কেমন ছিল সেই ভালবাসার পসরা? সেও এক চমকে ওঠার মত বিষয়।

একদিনের ঘটনা।

রাত গভীর থেকে আরও গভীরের দিকে যাচ্ছে।

চারপাশ নীরব-নিস্তব্ধ।

সবাই ঘুমে অচেতন। খুজায়মাও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সেই ঘুমের মধ্যেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন। মধুর এবং বিস্ময়কর এক স্বপ্ন। দেখলেন, তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে, খুব কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে চুমু খাচ্ছেন।

কী মাহিমান্বিত এক স্বপ্ন!

কিন্তু এও কি সম্ভব ? বাস্তবে ?

আর ঘুমুতে পারলেন না খুজায়মা। অপেক্ষায় আছেন, কখন ভোর হবে।

এক সময় শেষ হলো প্রতীক্ষার পালা। শেষ হলো অস্থিরতার কাল। তিনি ছুটলেন, ছুটলেন রাসূল (সা)-এর দরবারে। বললেন সকল কথা। রাতের গভীরে, ঘুমের মধ্যে দেখা সেই স্বপ্নের কথা। সব শুনে মুচকি হাসলেন রাসূল (সা)। তারপর সস্নেহে তাকালেন খুজায়মার দিকে। বললেন, 'খুজায়মা! তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো, তা বাস্তবেও পরিণত করতে পার।'

রাসূল (সা)-এর কথা শেষ না হতেই খাড়া হয়ে উঠলো খুজায়মার দেহের প্রতিটি পশম। আনন্দে এবং উত্তেজনায়। একী শুনছেন তিনি! এ যে কল্পনার ও অতীত!

কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু আদৌ তা অবিশ্বাস্য ছিল না।

সাত্যিই রাসূল (সা) খুজায়মার দিকে এগিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল। এবং খুজায়মা, সেই সৌভাগ্যবান মানুষটি আর আপেক্ষা না করে লুফে নিলেন সুযোগটি। তিনি রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখে চুমো এঁকে দিয়ে আবারোও উঠে এলেন সম্মান ও মর্যাদার এক সোনালি সূর্যের মুখে।

ঈমানের দীপ্তিতে ভাস্বর ছিলেন খুজায়মা (রা)।

ভাস্বর ছিলেন রাসূল (সা)-এর ভালোবাসায়। রাসূল (সা)-কে মেনে ছিলেন তিনি জীবন জাগার মহান সোপান।◎

# সাহসের দরিয়া

মক্কার একজন মহাপ্রতাপশালী গভর্নর। নাম খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কাশরী।

কাশরীর দাপট ছিল বহুদূর পর্যন্ত। তার ভয়ে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পেত না।

কারণ কি?

করণ তার মূলে ছিল কূফার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ।

হাজ্জাজের ছিল বেপরওয়া মনোভাব। আর ছিল ন্যায়-নীতিহীন একটি কঠিন হৃদয়।

তার সেই কঠিন হৃদয়কে ভয় পেত সবাই। সামান্য অপরাধের জন্যও তখন শাস্তি পেতে হত অত্যন্ত কঠিন। এমন কি কারণে, অকারণে গর্দানও চলে যেত।

এমনি পরিবেশে কে আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য বলে?

হয়তো বা অনেকেই বলে না। কিন্তু কেউ কেউ তো বলে।

হ্যাঁ, তারাই যে কোনো পরিবেশে সত্য বলার সাহস রাখেন, যারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করেন। যারা একমাত্র ভালোবাসেন তাঁকেই, যার উপর বিশ্বাস রাখেন যে, তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার জীবন এবং মৃত্যুর মালিক।

প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহর ওপর কেবল ভরসা করেন, তাঁকে ভয় করেন এবং ভালবাসেন, তারাই একমাত্র তারাই সকল সময় সত্য প্রকাশে থাকেন অসীম সাহসী। এমনি একজন সাহসী মানুষ ছিলেন মক্কায়।

নাম সাঈদ ইবনে জুবায়ের।

সাঈদ ছিলেন একজন নামকরা মুহাদ্দিস। ছিলেন সৎ এবং সাহসী।

সাঈদের সততা এবং সাহসের কথা মক্কার বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ফিরে বেড়ায় মানুষের মুখে মুখে। সত্যভাষণ, স্পষ্টবাদিতায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না সেই সময়ে।

সাঈদের এই সত্য ও স্পষ্টবাদিতায় ক্ষুব্ধ হলো মক্কার গভর্নর খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কাশরী। তিনি ক্ষেপে উঠলেন সাঈদের সাহসিকতায়।

কী, এত বড় স্পর্ধা! এত বড় সাহস! আমার রাজ্যে অত সত্য-টত্য চলবে না। যখন তখন সমালোচনা করাও সহ্য হবে না।

তিনি হুকুম দিলেন তার অনুচরদেরকে। 'যাও, সাঈদকে বন্দী করে আনো।'

যেমন হুকুম, তেমন কাজ।

সাঈদকে বন্দী করা হলো।

কিন্তু নির্ভীক সাঈদ।

তখনো তিনি সত্যের ওপর অবিচল। ঠিক যেন ওহুদ পর্বত। শত অত্যাচার আর শত প্রলোভনেও টলেন না এতটুকু।

সাঈদের দৃঢ়তা দেখে আরো বেশি করে ক্ষেপে ওঠেন কাশরী।

কিন্তু, তবুও অনড় সাঈদ।

কাশরী ভাবলেন, এখানে আর নয়। সাঈদকে পাঠিয়ে দেব এবার কূফায়। হাজ্জাজের কাছে। তারপর বুঝবে সে সত্য বলার মজাটা।

সত্যিই সাঈদকে পাঠানো হলো কুফায়, হাজ্জাজের কাছে।

হাজ্জাজ সাঈদকে কাছে ডাকলেন। তার সাথে বথা বললেন। তারপর কথা থেকে তর্ক। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর হাজ্জাজ সাঈদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এবার বলো তো আমার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি?'

সাঈদ বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমি আর কীইবা বলবো! আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন আপনার নিজের সম্পর্কে।'

হাজ্জাজ বলল, 'তবু, তবুও বলুন। আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাচ্ছি।'

সাঈদ মৃদু হেসে বলল, 'জানি, আমি যা বলবো, তা আপনার আদৌ পছন্দ হবে না। তবুও বলছি, আমি মনে করি আল্লাহর কিতাবের না ফরমানি করা আপনার জীবনের নিয়ম এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আপনি এখন পুরোপুরি ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আপনি যত্ত সব জঘন্য কাজ করেন। আর মনে করেন, তাতেই আপনার ক্ষমতা, শান শওকত এবং দাপট বৃদ্ধি পাবে। আসলে কি জানেন! আমার তো মনে হয় আপনার এসব অপকর্মই একদিন আপনার জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। ডেকে আনবে আপনার জন্য লাঞ্ছনা আর অপমানের মৃত্যু।'

হাজ্জাজ ক্ষেপে গেলেন, 'সাঈদ! তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ! জানো এর পরিণাম কি হতে পারে! সত্যিই তোমার জন্যে দুঃখ হয় সাঈদ! সত্যিই দুঃখ হয়।'

সাঈদ বললেন, 'হাসালেন বটে হাজ্জাজ! দুঃখ তো তার জন্যই হওয়া উচিত! যাকে জান্নাত থেকে মাহরুম করে নিক্ষেপ করা হয়েছে ভয়াবহ জাহান্নামে!'

হাজ্জাজ বলল, 'সাঈদ! তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। খামোখা সমালোচনা করে লাভ কি বলো! তাতে আছে কেবল শাস্তি আর যন্ত্রণা। তোমার সামনে কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ। চাইলে এর চেয়েও বেশি দেব। তুমি কেবল চুপ থাকবে, সাঈদ।'

সাঈদ বললেন, 'আমাকে হাসালেন হাজ্জাজ! আপনার অর্থ আমি কেন নিতে যাব? তার চেয়ে এগুলো আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিন। তাতে আপনার মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে।'

একটু থেমে সাঈদ আবার বললো, 'আপনি কি ভুলে গেছেন সেই ভয়াবহ দিনের কথা! যেদিন মা তার আদরের দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও ভুলে যাবে! আপনি সেদিনের সেই ভয়াবহ সময়ের কথা একটু ভাবুন। আবারও বলছি, সেই ভয়াবহ কিয়ামতের কথা একবার ভাবুন।'

সাঈদের কথা শুনে মুচকি হাসলেন হাজ্জাজ। তারপর সাঈদের সামনে বাদ্যযন্ত্র এবং বাঁশি বাজানোর নির্দেশ দিলেন হাজ্জাজ। তারপর বললেন, 'তুমি কি আমোদ-ফূর্তির এসব জিনিস কখনো দেখেছ সাঈদ?'

সাঈদ তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলেন, 'না! এই সঙ্গীত হলো করুণ। আর বাঁশির সুর আমাকে সেই কিয়ামতের দিনের সিঙ্গা বাজানোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আর এই বাঁশির কথা বলছেন? এ বাঁশি তো সেই কাঠ দিয়ে তৈরি, যে কাঠ আপনি অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করেছেন। আপনার অন্তত জানা উচিত, এই বাদ্যযন্ত্র যেসব বকরীর চামড়ার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সেইসব বকরীকে, বাদক ও নির্মাতাকেও হাজির করা হবে।'

সেদিন সত্যকে কেউ লুকোতে পারবে না। না, কেউ না।

সাঈদের কথা শুনে হাজ্জাজ এবার বারুদের মত জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'সাঈদ! তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার ধৈর্যেরও। আমি তোমাকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবো। হ্যাঁ, এমন নির্মমভাবে হত্যা করবো তোমাকে, যে অতীতে আর কখনো এমনভাবে কাউকে হত্যা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। এমনি ভয়ংকর, এমনি নিষ্ঠুর ও নির্মম হবে তোমার হত্যাকাণ্ড যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!'

হাজ্জাজের এই হুমকিতে হেসে উঠলেন সাঈদ। বললেন, 'আপনি আমাকে হত্যা করবেন তো! করুন। আপনি আমার দুনিয়া বরবাদ করবেন, আর আমি বরবাদ করবো আপনার আখেরাত। ঠিক আছে, আমাকে হত্যা করতে চাইলে করুন।'

হাজ্জাজ বললেন, 'হ্যাঁ তাই হবে সাঈদ! তোমার পরিণতি মৃত্যু। এখন বলো, তুমি কীভাবে মরতে চাও!'

সাঈদ আবারও হেসে জবাব দিলেন, 'হাজ্জাজ! পরকালে আপনি আপনার নিজের হত্যার জন্য যে পদ্ধতি পছন্দ করেন, আমার জন্য আপনি সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

হাজ্জাজ বলল, 'তবে কি তুমি চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেই?'

সাঈদ বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো না। তবুও যদি ক্ষমা করেই দেন, তবে সেটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং আপনি কোনো অবস্থাতেই দায়মুক্ত হতে পারবেন না, হাজ্জাজ!'

সাঈদের কথায় হাজ্জাজ এবার আরও রেগে গেলেন। অনুচরদের হুকুম দিলেন, যাও! একে নিয়ে যাও এবং নির্মমভাবে হত্যা কর।

হত্যার নির্দেশ শুনে সাঈদ এবার জোরে হেসে উঠলেন।

হাজ্জাজ বললেন, 'সাঈদ! তুমি হাসলে কেন?'

সাঈদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি হাসছি আল্লাহর মুকাবিলায় আপনার ধৃষ্টতা আর আপনার মুকাবিলায় আল্লাহর অপরিসীম ধৈর্য দেখে। সত্যি বলতে আমি আপনার পৈশাচিক এবং বর্বর উন্মাদনায় না হেসে পারছি না। জানি না আল্লাহ পাক আপনার জন্য কী ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।'

সাঈদের কথা শেষ না হতেই হাজ্জাজের নির্দেশে তাকে হত্যার জন্য নেয়া হলো।

হত্যার আগে সাঈদ মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার হত্যার পর এই জালিম ব্যক্তিটি যেন অন্য আর কাউকে হত্যা করতে না পারে। আর কাউকে হত্যা করার ক্ষমতা তাকে দিয়ো না হে রাহমানুর রহিম!'

আশ্চর্য!

সাঈদের হত্যার পরপরই রোগে ভুগে, ভীষণ কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ। সুতরাং তিনি আর কাউকে হত্যা করার সুযোগই পাননি।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের!

প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন সত্য এবং সাহসের এক দারুণ দরিয়া।

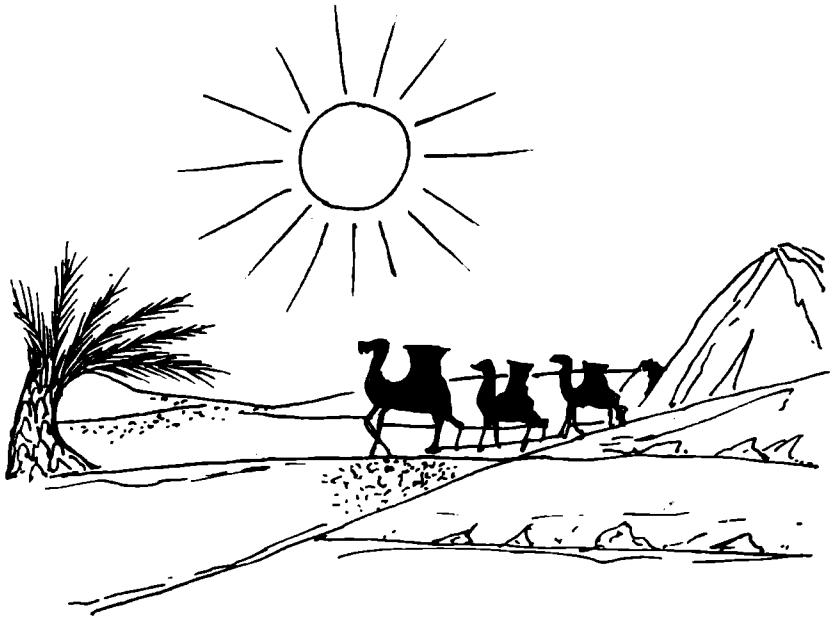

# মাটির পাঁজরে মোহন পুরুষ

দশজনের একটি দক্ষ বাহিনী।

রাসূল (সা) তাদেরকে পাঠাচ্ছেন মদীনা থেকে মক্কায় সেখানকার যাবতীয় গোপন খবরা-খবর সংগ্রহের জন্য।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশে আসেম ইবনে সাবেত আল-আনসারী (রা)-র নেতৃত্বে চলেছেন তারা মক্কার পথে। বন্ধুর পথ। অত্যন্ত দুর্গম। বালি আর বালি। উঁচু-নিচু মরুপথ। স্বয়ং রাসূল (সা)-ই তাদেরকে নির্বাচন করেছেন।

এই দলে আছেন খুবাইব ইবনে আদী ইবনে আমের (রা)।

খুবাইব (রা) খুবই সাহসী এক যোদ্ধা।

বদর যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

বদরে শুধু যুদ্ধই করেন নি, বরং এই যুদ্ধের সময় তিনি মুসলিম মুজাহিদদের মালামাল সংরক্ষণের দায়িত্বও পালন করেছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে।

খুবাইব (রা)-এর ওপর তাই রাসূল (সা)-এর আস্থা ছিল সীমাহীন।

খুবাইব (রা)-রা যাচ্ছেন আর যাচ্ছেন।

মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মরুঝড়। বয়ে যাচ্ছে সূর্যের প্রচণ্ড রোদের ঢল। তবুও ক্লান্তি কিংবা কষ্ট তাদেরকে পারছে না পরাজিত করতে।

তারা ছুটছেন ক্রমাগত সামনের দিকে।

চলতে চলতে তারা পৌঁছে গেছেন হাদয়া নামক স্থানে।

সেখানে বাস করে হুজাইল গোত্রের মানুষ। তারা যেমন ছিল মূর্খ বর্বর, তেমনি ছিল-ধূরন্ধর, লোভী। তাদের হিংস্রতার মাত্রা পশুকেও হার মানিয়েছিল।

সেই তারা, হুজাইল গোত্রের মানুষেরা এই সময় কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল, আসছে। আসছে একটি কাফেলা। শিকারের নেশায় তারা মত্ত তখন।

আর দেরি নয়। সাথে সাথে ছুটলো তারা শিকারের খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত তারা। কোথায় গেল শিকার ? কোথায় ? কোন দিকে ?

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেল তারা কিছু খেজুরের বিচি। আর সাথে সাথে তারা সমস্বরে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ পেয়েছি। এই তো তাদের খাওয়া খেজুরের বিচি। এই খেজুর এখানকার নয়। ইয়াসরিবের। সুতরাং কাফেলা যে ইয়াসরিবের বাসিন্দা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

খেজুরের বিচির দিকে তাকিয়ে লক লক করে উঠলো তাদের হিংস্রতার জিহবা। চোখে-মুখে লালসার আগুন। তারা আরো বেশি তৎপর হলো শিকারের খোঁজে।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান আসেম (রা)।

খুবাইব (রা)-সহ পুরো বাহিনী নিয়ে তিনিও ক্লান্ত। কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। তিনি বাহিনী নিয়ে আশ্রয় নিলেন একটি নিরাপদ টিলায়। কিন্তু এই টিলাটিও যে নিরাপদ নয় সে কথা বুঝতে পারেন নি বাহিনী প্রধান– আসেম (রা)।

তারা বিশ্রাম নিচ্ছেন।

শরীরে জমে আছে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি। একটু বিশ্রামের পর আবারও শুরু হবে পথ চলার।

প্রত্যেকের চোখদুটো বুজে আসতে চাইছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠতো।

কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর!

ততোক্ষণে খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের আরো কাছে চলে এসেছে খুজাইল গোত্রের সেই হিংস্র লোকেরা। তাদের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার।

এক সময় তারা দেখে ফেলে এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে। আর দেখামাত্রই, চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো তাদেরকে।

আসেম (রা)-এর বাহিনীও তরবারি বাগিয়ে প্রস্তুত হলেন।

হুজাইলের লোকেরা ছিল দারুণ চালাক। তারা বললো, 'তোমাদের হত্যার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তোমাদের বিনিময়ে আমরা কেবল মক্কাবাসীর কাছ থেকে কিছু সুবিধা লুটে নিতে চাই। আল্লাহর নামে আমরা অঙ্গীকার করছি, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না।'

আসেম (রা) বাহিনীর তিনজন সদস্য মরসাদ (রা), খালিদ ইবনে বুকাইর (রা) ও আসেম ইবনে সাবিত (রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা কোনো পৌত্তলিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারি না।'

ততোক্ষণে গর্জে উঠেছে তাদের তরবারি। মরতে তো হবেই। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরাই ভাল। যুদ্ধ করতে করতে তিনজন সাহাবীই শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করলেন।

বাকি সাহাবীদের মধ্যে খুবাইব (রা)-সহ তিনজনকে তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য করলো। কাফিররা এই আত্মসমর্পণকারী সাহাবীদের ধনুকের সূতা খুলে তাদের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেললো।

পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রা) কাফিরদের তীরের ফলায় শহীদ হলেন।

আর খুবাইব (রা) ও যায়িদ ইবনে আদ দাসিমা (রা)-কে মক্কায় নিয়ে অনেক অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।

খুবাইব (রা)-কে কিনেছিল এমন এক ব্যক্তি, যে বদর যুদ্ধে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। খুবাইব (রা)-কে দেখে তার সেই রক্তনেশা জেগে উঠলো। সে অনেক বেশি অর্থের বিনিময়ে কিনে নিল খুবাইব (রা)-কে।

কয়েক মাস কেটে গেল খুবাইব (রা)-এর বন্দি দশায়। পবিত্র হারাম মাসগুলো পার করার পর তারা খুবাইব (রা)-কে হত্যার তোড়জোড় শুরু করে দিল।

খুবাইব (রা)-ও ততোদিন জেনে গেছে যে তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করা হবে। এটা বুঝতে পেরে তিনি প্রহরীকে অনুরোধ করে বলেন–

১. আমাকে মিষ্টি পানি পান করাবে।

২. তাদের দেব-দেবীর নামে জবেহকৃত পশুর গোশত খেতে দেবে না।

৩. হত্যার পূর্বে যেন আমাকে জানানো হয়।

হত্যার আগে, খুবাইব (রা) একটি ধারালো ক্ষুর দিয়ে ক্ষৌরকার্য করছেন। এমন সময়ে উকবার একটি শিশু সন্তান তার কাছে এলো।

খুবাইব (রা) বাচ্চাদেরকে খুব আদর করতেন। তিনি কোলে তুলে নিলেন বাচ্চাটিকে। কোলে ছোট্ট বাচ্চা আর হাতে চকচকে ক্ষুর।

উকবার স্ত্রী এ দৃশ্য দেখে আতকে উঠলো।

ভাবলো, আমরা তো বন্দিকে হত্যা করবোই। এটা জেনে তিনি হয়তো আমাদের বাচ্চাটিকে হত্যা করে খুনের বদলা নেবেন।

খুবাইব (রা)-ও বুঝতে পারলেন উকবার স্ত্রীর আশংকার কারণ। তিনি একটু হেসে বললেন, তোমার ধারণা এ শিশুটিকে হত্যা করে আমি আমার রক্তের বদলা নেব! না। এমন কাজ আমি কক্ষণো করবো না। এমন জঘন্য চরিত্র আমাদের নয়। আমরা মুসলমান। বীরের জাত। বীরের মত হাসতে হাসতে আমরা মরতে পারি। হ্যাঁ, কেবল আমরাই পারি। তারপর একটু রসিকতা করে বললেন, 'আল্লাহ পাক এখন আমাকে তোমাদের ওপর বিজয়ী করেছেন।'

একথা শুনে শিশুটির মা প্রায় কেঁদে ফেললো। বললো, 'তোমার কাছে আমি এটি আশা করিনি।'

হাসলেন খুবাইব (রা)। ক্ষুরটি মুহূর্তেই মহিলার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। আমি তোমার সাথে একটু মশকরা করছিলাম মাত্র।'

উকবার স্ত্রী– এই মহিলা খুবাইব (রা)-এর আচরণে এতই মুগ্ধ হন যে তার হত্যার পর তিনি মুসলমান হয়ে যান। তিনি পরবর্তীতে বলেন, 'আমি এই খুবাইব (রা)-এর চেয়ে ভাল কোনো কয়েদি আর কখনো দেখিনি। কয়েদখানার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতাম খুবাইব (রা)-এর হাতে মানুষের মাথার মত বড় বড় আঙ্গুর। তিনি আঙ্গুর খাচ্ছেন। এমন আঙ্গুর পৃথিবীর কোনো বাগানে ছিল না। তাছাড়া তিনি তো লোহার হাতকড়া অবস্থায় বন্দি। তবে কোথা থেকে এলো এই আঙ্গুর ? কোথায় পেলেন তিনি ? এ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত বিশেষ খাদ্য।[২]

খুবাইব (রা) বন্দি অবস্থায় আছেন উকবার কয়েদখানায়।

তাকে হত্যা করা হবে।

তোড়জোড় চলছে।

হারাম শরীফের অদূর তানঈম নামক স্থানে একটি শূলীকাষ্ঠে ঝোলানো হলো।

তারপর ঢোল শুহরত বাজিয়ে মক্কার সকল শ্রেণীর মানুষকে জানানো হলো বিষয়টি।

চারপাশ থেকে ভেঙে এলো মানুষ। নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক বৃদ্ধ, সবাই।

খুবাইব (রা)-কে হত্যা করা হবে। এটা যেন এক মহাউৎসবের ব্যাপার কাফেরদের কাছে।

বড্ড অন্যায়ভাবে হত্যা!

অথচ তাদের কাছে বিষয়টি আনন্দ এবং উপভোগের।

কী নির্মম তামাশা!

কী জঘন্য তামাশা, একজন সাহাবীর জীবন নিয়ে!

ওদিকে সবই প্রস্তুত।

উকবার কয়েদখানা থেকে খুবাইব (রা)-কে নেবার জন্য এলো মানুষ।

তাদেরকে খুবাইব (রা) বললেন, 'দাঁড়াও! একটু সবর করো। আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করবো। খুবই সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত নামাজ। নামাজ দীর্ঘ করলে তোমরা আবার হয়তো ভাববে, মৃত্যু ভয়ে আমি নামাজ দীর্ঘ করছি। না, তা কক্ষণো করবো না।'

দু'রাকাত নামাজ শেষ করে তিনি মৃত্যুর দিকে চললেন।

চললেন বধ্যভূমির দিকে।

চললেন শূলীকাষ্ঠের দিকে।

তিনি চলছেন আর মুখে উচ্চারণ করছেন, 'হে আল্লাহ! তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ। এক এক করে তাদের হত্যা কর এবং তাদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।'

তানঈমের সেই গাছের নিচে, সেই শূলের কাছে যখন তিনি পৌঁছুলেন তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো কবিতার কয়টি চরণ–

১. আমি যদি মুসলমান হই তাহলে আমার মৃতদেহ কোন পাশে পড়ে থাকবে সে ব্যাপারে আমার কোনো পরোয়া নেই।

২. যা কিছু হচ্ছে, সবই আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রেমের পথে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ড-বিখণ্ড দেহের ওপরও করুণা বর্ষণ করতে পারেন।

শূলীতে ঝুলানোর পূর্বে, খুবাইব (রা) দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূল (সা)-এর বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আপনি আমাদের সংবাদ আপনার রাসূল (সা)-এর কাছে পৌঁছে দিন।'

খুবাইব (রা)-কে ঝুলানো হলো শূলীতে। তারপর তীক্ষ্ণ-ধারালো বল্লমের আঘাতে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো তাকে।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো হাজার হাজার মানুষ। আনন্দের সাথে। খুবাইব (রা) এবং যায়িদ ইবনে আদ দাসিমা (রা)-কে একই দিনে হত্যা করা হয়।

আর যেদিন তাদেরকে হত্যা করা হয়, সেই দিনই মদীনায় রাসূল (সা)-কে বলতে শুনা যায়, 'তোমাদের দু'জনের প্রতি সালাম।'

তাদের হত্যার খবরটি ওহীর মাধ্যমে জেনে যান দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

স্থির থাকতে পারছেন না রাসূল (সা)।

তার একান্ত প্রিয়জনদের এমন নিষ্ঠুর হত্যার খবর জেনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। সাথে সাথেই রাসূল (সা) আর একটি বাহিনী পাঠালেন লাশ মুক্ত করার জন্যে।

কাফেররা পাহারা দিচ্ছে খুবাইব (রা)-এর লাশ। তখনো ঝুলে আছে শূলীতে।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশে একদল দক্ষ সাহাবী এগিয়ে এলেন।

খুবই সুকৌশলে পৌঁছে গেলেন শূলীর কাছে। তারপর আমর, হযরত আমরই শূলী থেকে খুবাইবের লাশ মুক্ত করে ছুঁড়ে দিলেন একটু দূরে।

তারপর নেমে এলেন সন্তর্পণে। খুব সাবধানে।

কিন্তু একি!

নিচে নেমেই আমর অবাক হলেন।

কই? কোথায় গেল খুবাইব (রা)-এর লাশটি! এইতো, এখনই আমিই তো তাকে নামিয়ে দিলাম মাটিতে!

তিনি খুঁজলেন চারপাশ।

খুব ভাল করে। তন্ন তন্ন করে।

কিন্তু না, কোথাও পাওয়া গেল না খুবাইবের লাশ।

পাবে কোথায়?

ততোক্ষণে তো মাটিই প্রিয় এবং পবিত্র এক সাহসী পুরুষকে টেনে নিয়েছে আপন পাঁজরের ভেতর, পরম আনন্দে। মুহূর্তেই। ঘুমুচ্ছেন খুবাইব (রা)। প্রশান্ত, স্থির। ততোধিক উজ্জ্বল। ঘুমুচ্ছেন মাটির পাঁজরে মোহন পুরুষ। পরম নিশ্চিন্তে।

কাফেরের সাধ্য কি ছুঁতে পারে অপবিত্র হাতে খুবাইব (রা)-এর মত মুজাহিদের পবিত্র শরীর? ◎

## সমাপ্ত

'কবি মোশাররফ হোসেন খান' —একটি ব্যাপক পরিচিত নাম। 'কায়েস মাহমুদ' ছদ্মনামে তিনি 'কিশোর কণ্ঠ' পত্রিকায় 'সাহসী মানুষের গল্প' শিরোনামে দীর্ঘদিন যাবত লিখছেন। সেখান থেকেই কয়েকটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নেবিশিত করা হলো।

রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে তিনি চমৎকারভাবে গল্পাকারে উপস্থাপন করেছেন।

শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ-সরল এবং সাবলীল ভাষায় লেখা তার এই গল্পগুলো সব ধরনের পাঠককেই আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। —প্রকাশক